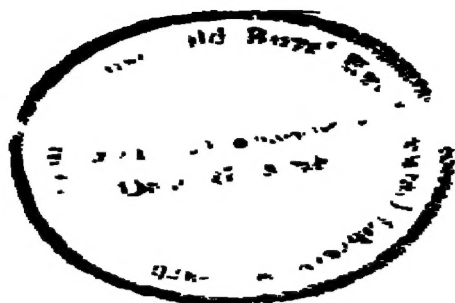


গদ্যনাভ



জ্যোতির্ময় রাই



দি বুক এন্ডারিসনস লিমিটেড
১৩৫১

ଅକ୍ଷୟ-ଶିଳ୍ପୀ—ଶ୍ରୀବାସିନୀ ରାୟ

ପ୍ରେମ ସଂକଳନ

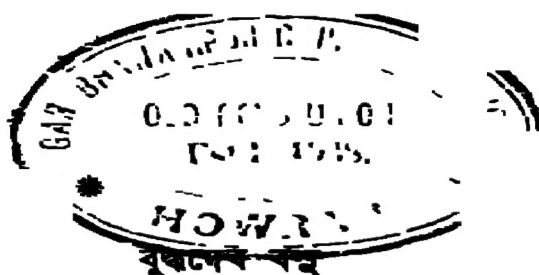
ଅଗ୍ରହାରଣ ୧୭୫୮

ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳନ

ସାଧ ୧୭୫୯

ସାଧ : ୧୫୦

ମୁଦ୍ରଣ—ସି ଶ୍ରୀକିଶୋର ହାଉସ, ୧୦ ଅମାର ନାଥବୁଲାର ରୋଡ, କଲକତା
ଅକାଶ-ହାସ—ସି ବୁକ ଏମ୍ପରସ୍ ମି., ୨୨-୧ କର୍ମଗୋଷ୍ଠି ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, କଲକତା
ବିକ୍ରୟ ଓ ଅକାଶକ—ବିରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ



বুকের বন্ধ

প্রতিভা বন্ধ

করকমলে—

পদ্মনাভ

ফাঁকি

সস্তা

গেডিক্স সিট

নেপথ্যে

ভারিকি

মনিব্যাগ

বৈচিত্র্য

স্বরভি

সওদা

কলপ



অবাক হবার কথটা শনিমোহনের শার্চি রকমের। আকাশে উড়োজাহাজ দেখে সে-আন্দাজ অবাক হয়, বাজারে ঢুকে মাছের দান ছ'পরসা চড়তি দেখলেও সে-আন্দাজ অবাক হয়। আজ বাড়ির লোকগুলোর কাণ্ড দেখেও সে কম অবাক হয়নি, ছেলে পরীক্ষা দিতে বাবে তা নিয়ে সকাল থেকে অবন হুঁড়োহুড়ির ধরকারটা কি। এত এত টাকা খরচা ক'রে মাস্টার রাখা, বইপত্তর কেনা, সবই তো করা হয়েছে, এখন শুধু দুটো নাকি অবাব লিখে আসা, এ নিয়ে আজ ক'মাস যাবৎ কি চিন্তা আর কি কাণ্ডই না চলছে। এদিকে যেহেতু যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না সেটা বেন কিছুই নয়; আজ পর্যন্ত একবার ডাকার দেখানো হলো না। বউনা তার ছেলে ছেলে ক'রেই অস্থির—শনিমোহনের মন রীতিমতো বিকল হয়ে উঠে স্নানানীর উপর।

স্নানানী বলেন, 'একটু হাত চালিয়ে নাও শনি, বিমল চান ক'রে এলো ব'লে—ভুনি বড়ো চিলে।'

অতি পুরোনো চাকর গরুর গাড়ীর চাকার মতো নড়বড়ে চালে চলে কম, নখ করে বেশি—শনিমোহনের কাজ বা এগুলো তার চেয়ে বাড়লো বেশি কথার-বিড়বিড়ি। আজ সকাল থেকে মেজাজটা তার বিগড়ে আছে। থেকে থেকে অনমনস্ক হয়ে পড়ছে ব'লে চিলেবিটাও একটু বেড়েছে।

পদ্ম নাভ

সকালে উঠেই শশিমোহন তার নারায়ণের ছবির সামনে মাথা ঠুঁকে প্রণাম জানায়। আজ প্রণাম সেয়ে উঠতেই দেখতে পেয়েছে ছবিখানা ছলছে। এমন অবাক কাণ্ড আর কখনো সে দেখেনি। খোলা দরজার কাছে হাত রেখে হাওয়ার জোরটা একবার পরখ করেছে—কিন্তু হাওয়া নয়, হাওয়া হলে সেটা তার গায়েও লাগতো। ছবিখানা সামনে ঝুঁকে, না এপাশ-ওপাশে ছলছে সে-গবেষণাতেও অনেকটা সময় তার কেটে গেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবির অল্পকরণে মাথা ছলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে সেটা হ্যাঁ কি না।

শেষ পর্বস্ত সম্মতিসূচক ব'লেই যখন সাব্যস্ত হলো তখন শশিমোহনের ষটকা বাজলো নিজের মনের বখাটি নিয়ে। ঠিক সেই সময়টাতে কি তার মনে ছিলো? 'স্মিদিদির কোনো অমঙ্গল হবে না তো?'—সর্বনাশ, এমন কথা নিশ্চয়ই তার মনে ছিলো না। শশিমোহন বড়ই ভয় পেয়ে যায়, 'স্মিতা ভালো হ'য়ে উঠবে কিনা, এ প্রশ্নটা বার বার গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করে। সমস্তটা দিন তার কাটে মনের এই খুঁৎখুঁতি নিয়ে।

সন্ধ্যার পর থেকে স্মহাসিনীর হাবভাব দেখেই শশিমোহন বুঝলো অসুখটা স্মিতার বেড়েছে। সে অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়লো স্মহাসিনীর মুখের গুমট ভাবটা তার ভালো লাগে না, এমন ব্যার ব্যার শরীর সে এখন ডাক্তার না ডেকে আছে কি ক'রে সেটাও ছবোধ্য মনে হয়। কিছুক্ষণ প্যানপ্যান ক'রে কোনোই যখন সন্ধ্যার হয় না, শশিমোহন ত্যক্ত হ'য়ে চ'লে যায় বিয়লের ঘরের দিকে।

বিয়লের বাস্টার বিদ্যেয় না হওয়া পর্বস্ত শশিমোহন আজকাল

বিমলের ঘরে ঢোকে না। পড়ার সময় একদিন আলাপ জমতে গিয়ে মাস্টারের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিলো, সেই থেকে হতোম-প্যাচার মতো ঐ গম্ভীর মুখটা দেখলেই তার গা জ্বালা করে। আজ ঠুকে গ্রাস করবে না মনস্ব ক'রে ঘরে ঢুকেই সে বলতে লাগলো, 'জ্যাঁষো দাদাবাবু, পরীক্ষা তো খুব দিচ্ছ, এখন পড়া রেখে আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোনো তো বাপু—'

বিমলের মাস্টার মশাই ঝাতার উপর পেঙ্গিলটা টিপে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'উজবুকের মতো কথা ব'লো না, এখান থেকে এখন বাও বলছি।'

লোকটির কথা অমান্য করতে বা তার মুখের উপর জবাব দিতে সাহস পেলো না ব'লেই শনিমোহনের অন্তর্দাহটা বেড়ে গেলো। ঝাপটা মেয়ে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে এলো।—বলে কিনা উজবুকের মতো! গাধার মতো কথা বলার কথা সে শুনেছে, কিন্তু উজবুকের আবার কেমন জানোয়ার—নিশ্চয়ই গাধার চেয়েও হীন কিছু হবে; ভয় কেড়ে রাগটা শনিমোহনের চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো।

একটু থম্ মেয়ে থেকে নিখল ক্রোধে জোরে জোরে পা কেলে সে চ'লে গেলো বাড়ির ভিতর। নারায়ণ এদের মজল ককন, এদের মেয়ে এরা যেমন খুশি কেলে রাখুক, তা নিয়ে তার এতটা হেনস্তা হবার দরকারটা কি।

আপন মনে বকতে বকতে শনিমোহন রাতের কাজ শেষ করলো, তারপর আর তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না।

মটু ছেলেনাছব, সে অনেকক্ষণ হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো জ্বলছে বিমলের ঘরে। সুহাসিনী সাবনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন,

পদ্ম নাত

তারপর এগিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে দেখে এলেন সদর দরজাটা বন্ধ আছে কিনা।

কিরে এসে যখন বিমলের ঘরে ঢুকলেন, মা'র মুখের দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বিমল প্রশ্ন করলো, 'কি মা—দিদির অস্থখ কি খুব বেড়েছে? ডাক্তারকে—'

'একটু বেড়েছে, তা—ডাক্তারের দরকার নেই, দেখি কি হয়।'।

এক মাসের উপর হতে চললো মেয়েদের শারীরিক নিয়মের ব্যতিক্রমজনিত অস্থস্থতার হুমিডা ভুগছে, তাই ঘর ছেড়ে সে বড়ো একটা বেরোর না, এটুকুই বিমল জানে। ডাক্তার ডাকবার কথা পূর্বেও সে ছ'একবার বলেছে, কিন্তু মা তেমন গা করেন নি ব'লে চুপ ক'রে গেছে। আজ সন্ধ্যার পর থেকে মা হুমিডাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, এখন তার চোখ-মুখের ভাব দেখে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে বই রেখে বিমল উঠে পাড়ালো।

'না মা, কিছু একটা বাড়াবাড়ি হবার আগেই ডাক্তার দেখানো ভালো।'।

'ভয়ের কোনো কারণ থাকলে আমি বুঝতাম—তাকেও বলতাম। এখন যা তো বাবা শুনে পড় গে, পরীক্ষা চলছে, রাত জেগে তোর আবার কিছু একটা না হ'য়ে পড়ে।'।

'বারোটা অবধি তো রোজই পড়ি, মা।'।

'না বিমল, অস্থখ-বিস্থখ দেখে মন আমার ভারি ধারাপ হয়ে গেছে—তুই শুতে যা। একরকম জোর ক'রেই বিমলকে তুইয়ে দিবে সুহাসিনী ঘরের লঠনটা নিবিয়ে দিলেন।

পদ্ম নাত

ঘণ্টাখানেক পর স্হাসিনী বেরিয়ে এলেন স্হমিতার ঘর থেকে। বাইরের ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য তিনি শুক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন—ভয়ে তাঁর হাত পা ভারি হয়ে এসেছে। স্বামীর কথা স্হাসিনীর মনে পড়ে, তিনি জীবিত থাকলে এতটা ভয় ভাবনার ভিতরও এমন নিঃসহায় বোধ তিনি করতেন না। স্হমিতার বিয়ে দিয়েই তিনি চিরদিনের জন্য ছুটি নিলেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া কোনো কর্তব্যই তো স্হাসিনী অবহেলা করেন নি, তা ছাড়া জীবনে এমন কোনো অন্তায় করেছেন বলেও তাঁর মনে পড়ে না যার প্রতিফলে এতবড়ো অভিশাপ তাঁর প্রাপ্য হতে পারে।

ছোট মেয়ে স্হমিতার বিয়ে দিয়েছেন স্হাসিনী নিজে। দিন দুই হলো আমাই লিখেছে, স্হমিতা অন্তঃসত্ত্বা। এই প্রথমবার, স্হমিতা নাকি অস্থির হয়ে উঠেছে মা'র কাছে আসবার জন্যে—শিগুগিরই তাকে পাঠাবে। এই মেয়ে আমাই, আত্মীয়-স্বজন, মান-সম্মান সবই বুঝিবা ছাড়তে হবে—স্হাসিনী ন'ড়ে চ'ড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন, না, ভয় পেলে তাঁর চলবে না।

ঘরে ঢুকে খাঁচ ক'রে দেখলেন বিমল ঘুমিয়েছে কিনা। ব্যাপারটা বিমলের চোখের আড়ালে রাখতে স্হাসিনীকে কম বেগ পেতে হয় নি। এসব বিষয়ে বিমলের দৃষ্টিটা একটু ভেঁতা, তার উপর দু'তিন মাস বাবু সে তার পড়াশুনা নিয়েই অভিমান্যায় ব্যস্ত—তাই বুঝিবা এতটা সম্ভব হয়েছে।

বিমল ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যি তখন তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু একা সবদিক তিনি সামলাবেন কি ক'রে। সাহস সঙ্কয়ের সব চেটাকে তাঁর ব্যর্থ ক'রে হাত পা বেন ভয়ে গুটিয়ে আসতে

চাচ্ছিলো। একজন কাউকে তাঁর দরকার বার উপর নির্ভর করা যায়, বাকি বিশ্বাস করা যায়।

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে সুহাসিনী আড়িনায় নেবে এলেন। পশ্চিমের ভিটের একখানা একতলা, তাতে দুটোই মোটে ঘর; তারই একটার জানালার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো দেখা যাচ্ছিলো। একটু ঠেলে দিতেই জানালা খুলে গেলো। ভিতরে দেয়ালের নীচের দিকে পেরেকের লটুকানো একখানা নারায়ণের ছবি, যার নাভি-পদ্মে ব'লে আছেন চার মাথাওয়ালা ব্রহ্মা, তারই সামনে চোখ বুজে ব'লে আছে মস্তিষ্কহীন শশিমোহন।

শশিমোহন চোখ বুজে থাকে ইহলোক ভুলবার জন্তে নয়, ইহলোকের আবেদনকে একাগ্র করতে। নিজের হয়ে চাইবার তার কিছু নেই, সব আবেদন নিবেদন তার স্মিতারই জন্তে—স্মিতাকে সে কোলে পিঠে ক'রে বাহুব করেছে। স্মিতার এবারকার অসুস্থতা নিয়ে তার মনে বড়ই অশান্তি, সামনে থেকে দেখাশুনা না করতে পারাটাই হয়েছে তার সব চাইতে বড়ো অসোয়াস্তির কারণ। স্মিতার অসুস্থটা আজ বেড়েছে কিন্তু প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই হয়নি সে জানে, তাই নিরুপায় হয়ে চোখ বুজে বসেছে তার দেবতার কাছে।

এ পরিবারে প্রথম প্রবেশ করে শশিমোহন ছোকরা-চাকর হিসেবে। বৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ের সীমা রেখায় আজ এসে পৌঁছেছে কিন্তু আপনার বলতে এ পরিবারের বাইরে কেউ তার নেই, হবে ব'লেও আশা রাখে না। শান্ত, সরল, ভালো মানুষ এই শশিমোহন—নির্ভর করতে যদিও বা চোখ মেলতে হয়, বিশ্বাস রাখা

বায় তার উপর চোখ বুজে। বিশেষ ক'রে স্থিতির ভালোর জন্তে সে যে সব কিছুই করতে রাজি এ-কথা সকলেই জানে।

সুহাসিনী জানলার দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'শশি—'

শশিমোহন চম্কে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। 'কে—বউমা।' জন্ত উঠে এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলো, 'কি বউমা, কি হয়েছে?'

সুহাসিনী আন্তে আন্তে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তার মুখ দেখে শশিমোহন ধমকে গেলো। অমন শান্ত হৃদয় মুখখানা যেন জ'বে শক্ত হ'য়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে ক্যাকাশে গলায় সে জিজ্ঞেস করলো 'কি বউমা, আমার স্থিতিদির কিছু হয়নি তো?'

'ভারি বিপদ আমাদের শশি—'

বিপদ শশিমোহন সেটা বুঝেছে—কি বিপদ জানবার জন্তে ভীত ব্যাকুল চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

শুকনো গলাটা একবার কেড়ে নিয়ে সুহাসিনী বললেন, 'স্থিতি-র সন্তান হবে শশি।'

সন্তান হবে। এ তো আনন্দের কথা। অনেক কালের সাধ শশির সার্থক হতে চলেছে, স্থিতির হাসিতে তার মুখচোখ উজ্জল হয়ে উঠলো। এমন ক্ষেত্রে সচরাচর বা ব'লে ভরসা দেওয়া হয় তাই তার মনে পড়ে, 'ভালোয় ভালোয় দু'ভাগ হ'য়ে যাবে বউমা কিছু ভেবো না'—ছবিখানার দিকে একবার তাকায়, 'মাখার ওপর নারায়ণ আছেন,' উবু হ'য়ে জোড়হস্তে প্রণাম জানায়।

সুহাসিনীর ক্র কুণ্ডিত হয়ে আসে। স্নেহপ্রবণ সাদাসিধে শোকটিকে বোকা বলতে তাঁর বাখলো, বললেন, 'বুড়ো হতে চললে শশি তবু সামান্য হ'লটুকু তোমার হলো না। আজ তিন বছর হ'তে

পদ্ম নাভ

চললো আশাই-এর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হ'রে গেছে সেটা কি তুলে গেছ—এ যে ভয়ানক কলঙ্কের কথা।'

শনিমোহনের বাথার বেন ঝাঁকুনি লাগে। তাই তো, ভগবানের কাছে চাইবার সময় অত হিসেব তো সে করে নি। হুমিতার মঙ্গল কাশনা করতে গিয়ে কি সে চাইতে পারে তার হৃদয় পেতো না। বার স্বামী বোখাই না কোন শহরে বে-খা ক'রে সংসার পেতে বসেছে তাকে ভগবানই বা কোন পথ দিয়ে হুখ শান্তি দেবেন। এমন অবস্থায় শুধু একটি ধোকা বা খুকি থাকলে তার ও তার হুমিদিদির দিন বেশ কেটে যেতো, এ কথাই সে চোখ বুজে ভেবে এসেছে। তা ছাড়া এ তার আজকের আকাজক্ষা নয়, সেই হুমিতা বখন তার কোলে চেপে বেড়াতো তখন থেকেই হুমিতার ছেলেকে কোলে নেবার বাসনা তার মনে বাসা বেঁধেছে। এতদিনকার অতৃপ্ত বাসনাটা তাই আকস্মিক মুহূর্তে আগুপেছ না ভেবেই বুকিবা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলো।

শনিমোহন তার নিবুদ্ধিতার জন্তে নিজেকে বিচার দেয়। বীরে বীরে বিষয়টা তার কাছে সহজ হয়ে আসতে থাকে। কিছুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে। লম্বা-চওড়া স্থল্লর মতো চেহারার এক তদ্রলোক আসতো এ বাড়িতে, বার নামটা সে সঠিক উচ্চারণ করতে পারতো না ব'লে সবাই কত না হাসাহাসি করতো—সেই লোকটির সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করার অপরাধে হুমিতাকে অনেকবার সে বকুনি খেতে শুনেছে বউমা'র কাছে। শেষ পর্যন্ত তদ্রলোককে এ-বাড়িতে আসতে বারণ ক'রে দেওয়া হয়েছিলো, এও সে জানে।

ঘটনার গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধিতে আসতেই সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা না করে শশিমোহন বলে বসলো, 'হুমিদিমিকে কোথাও পাঠিয়ে দেও বউমা, আমি ওদের প্রাণ দিয়ে দেখানোনা করবো।'

'তুমি বড়ো কম বোক শশি, তা সম্ভব নয়।'

'তবে সম্ভানটাকে দাও, নিয়ে চ'লে যাই একমিকে।'

'ওটাকে বাঁচাবার কোনো মানে হয় না শশি—সারা জীবন দশজনের কাছে যেমার আর অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।'

'তবে—তবে কি করবে বউমা, মেরে ফেলবে?' ভীত অসংসত কণ্ঠে শশিমোহন বলে ওঠে।

'চুপ, আস্তে—' স্হাসিনী চাপা গলায় বলতে থাকেন, 'এ ভয়ানক অপরাধ—এর ভয়ানক শাস্তি। কিন্তু উপায় নেই,' স্হাসিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, 'জীবনে একথা মুখে এনো না শশি।'

মৃদু শশিমোহন অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এসব কেমন কথা! এর জন্য অপরাধ, জীবন অপরাধ, জীবন নষ্ট করা অপরাধ—কী তবে করতে হবে। বড়ই জটিল মনে হয় শশিমোহনের কাছে, হতাশ হয়ে বলে, 'যা হয় তুমি করো বউমা, আমি মূর্খ মানুষ আমি কি আর বলবো।'

শশিমোহনকে নিয়ে স্মৃতির ঘরে ঢুকে স্হাসিনী দরজা বন্ধ করে দিলেন। বিপদের মুখে আবার লজ্জা-শ্রম কিসের। একজন কাউকে তিনি প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চান—অনভ্যস্ত এ অস্থায়ের পাশে নিঃসঙ্গতা তাঁর দুঃসহ মনে হয়।

স্মৃতি শুয়ে আছে একটা তক্তপোশের উপর। মাথার আশে-পাশে ছড়ানো একরাশ চুল, এলোমেলো সেই কালো চুলের

মাঝখানে তার শুভ্র হৃদয় মুখ এলিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত চোখ মেলে সে একবার তাকালো। শশিমোহনের ভিত্তিত চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন তার মনে অনেকখানি ভরসা এনে দেয়—ও চোখে তাকাতা নেই, তিরস্কার নেই। তার বেঁচে থাকবার সবটুকু যুক্তি, সবটুকু শক্তি সে যুক্তি খুঁজে পায় ঐ ছুটি চোখের ভিতর। অশিক্ষিত এই বোকা লোকটিকেই আজ তার সব চাইতে আপনার মনে হয়।

স্বমিতার ব্যাথা আবার তার উরু বেয়ে কোমর অবধি উঠে অসহ্য তীব্রতার ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কলঙ্কের ভয়ে নয়, সহ্য করবার ক্ষমতাটাই স্বমিতার অপরিণীত। বেদনা-সূচক ক্রীণ শব্দটুকুও তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয় না। উদ্গত আর্তনাদ রোধ করতে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বার, মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো আগ্রাণ শক্তিতে শক্ত হয়ে আসে। শুধু মাঝে মাঝে সজোরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস।

স্বহাসিনী স্বমিতার দেহকে প্রয়োজনীয় ভক্তিতে শুইয়ে দিলেন। স্বমিতার সঙ্কোচের অস্ত থাকে না। কিন্তু স্নেহাঙ্ক এই প্রৌঢ় লোকটির অস্থপস্থিতি সে-দ্রুতি ভাবতে পারে না,—তাই নিঃশব্দে চোখ বুজে মাথাটাকে অস্ত পাশে এলিয়ে দেয়।

শশিমোহনের কৃষ্ণবর্ণ দীঘল দেহ দেয়ালের গা বেঁবে নিশ্চল হয়ে রইলো। অনাবৃত স্বহৃদয় দেহ, মাতৃজন্মের বিদ্যুত তোরণ তার চোখে ফুটিয়ে তুললো অগাধ বিশ্বয়—গত ও ভবিষ্যৎ তার মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেলো। পুত্র জন্ম সে দেখেছে কিন্তু মাহুকের আবির্ভাব কখনো দেখে নি, মন তার উৎকণ্ঠিত সশব্দ-আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকে।

বীরে বীরে মাহুকের শিশু মাহুকের জঠর থেকে মুক্ত হয়ে মাহুকের হাতে আশ্রয় নিলো, আর মুহুর্তে সে-হাত শিখান থেকে স'রে এসে ফুট করে দাঁড়ালো তার শাস-প্রশাসের পথ দুটোকে। সত্ত্বজাত দুর্বল স্নায়ুর ক্ষণিক কুঞ্জন ও প্রসারণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেলো ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষীণ প্রতিবাদ।

শশিমোহনের অন্তরটা আত্ননাদ ক'রে উঠলো, কিন্তু ভয়ে তার মূখ দিয়ে সামান্য শব্দটুকুও বেরলো না।

স্বহাসিনী সন্তানটাকে তেমনি ব'রে থেকে বললেন, 'শশি নিগগির এসো, স্থমির'র নাভির উপরটায় খুব জোরে ছ'হাত দিয়ে চেপে ধরো।'

কেন, তার স্থমিদিদিকেও মেরে ফেলতে চায় নাকি। 'না বউমা এ আমি পারবো না, এ আমি হতে দেবো না।' দৃঢ় স্বরে শশিমোহন প্রতিবাদ জানালো।

'আঃ—' চাপা গলায় স্বহাসিনী ধমকে উঠলেন। শশিমোহনের তুল বুঝতে পেরে বললেন, 'ওর ভালোর অন্তেই ওরকম করা দরকার। বলছি যা শোন, খুব জোর দিয়ে চেপে ধরো।'

এবার শশিমোহন স্বহাসিনীর কথায় বিশ্বাস ক'রে এগিয়ে গেলো।

খুবই সহজে ও স্বল্প সময়ে গর্ভকুস্থল ব'লে পড়লো। স্বহাসিনীর সে-হাতের তলায় মুহুর্ত আগে একটা জীবন নষ্ট হ'য়ে গেছে, সে-হাতই স্থমিতার জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্তে সম্ভরণে ফুলটাকে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো সবটা বেরিয়েছে কিনা।

স্বহাসিনীর নির্দেশ মতো হাতের চাপ ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই শশিমোহনের যা নজরে পড়লো তাতে সে ভয়ে ও বিস্ময়ে আঁৎকে উঠলো। এবার আর নিষেকে সে দমন করতে পারলো না, ব'লে

পদ্ম নাভ

উঠলো, ‘আঃ হা—কি সর্বনাশ করেছে! বউমা, এ যে স্বয়ং নারায়ণ, দেখছে না নাভিপদ্ম রয়েছে যে!’

‘আঃ, চুপ করো শশি, তুমি বড়ো বোকা—এরকমই হয়।’

এরকমই হয়, বউমা বলে কি। নাভির বোটার ওরকম পদ্ম নারায়ণ ছাড়া আর কারুর হতে পারে নাকি, হয় বললেই শশিমোহন বিশ্বাস করবে কেন? ভয়ে চোখ বুজে সে ব’সে পড়ে, মনে মনে কেবলই বলতে থাকে, সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে।

স্বহাসিনী ডাকলেন, ‘শশি—’

শশিমোহন চোখ মেলে উঠে দাঁড়ালো, তারপর স্বয়ংচালিতের মতো সে স্বহাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে আড়িনায় নেবে এলো।

শশিমোহনের দিন এক রকম কেটে যায় কিন্তু মন থেকে ভয় তার কিছুতেই কাটতে চায় না। তার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস হ’য়ে গেছে এ-পরিবারে একটা সর্বনাশ অনিবার্য।

স্বহাসিনীর মনও আশঙ্কায় ভীত হয়ে আছে, তবে কিনা নিষ্পেক্ষে প্রবোধ দেবার মতো হুক্তি তিনি খুঁজে পান। ক্ষুদ্র নাক ও মুখের উপর ঝারা তাঁর হাতটা চেপে ধরেছিলো তিনি তার একটা অংশ মাত্র, একথা স্বখন ভাবতে পারেন, অসংখ্যের দায় ক্ষুদ্রাংশ হয়ে মনটাকে তাঁর একটু হালকা ক’রে আনে।

কিছুদিন হ’লো অমিতা এখানে এসেছে।

পদ্ম নাত

কোনো শুভ কাজে হাত দেবার মতো সাহস আর স্থাসিনীর মাই। তাঁর ইচ্ছা ছিলো না অমিতা এবার এখানে আসে। কিন্তু এই তার প্রথম বার, কি অজুহাতে আসতে তাকে বারণ করা বার তাবতে ভাবতেই সে একদিন এসে উপস্থিত হলো।

অমিতার সাধনকালের দিন অতিথি অভ্যাগততে বাড়ি ভ'রে ওঠে। স্থাসিনীর দেওয়া 'সাধে'র শাড়ি প'রে অমিতা ঘুড়ে বেড়ায়, ছিপছিপে লম্বা মাহুটিকে একটু বেন খাটো দেখায়।

অমিতাকে দেখলেই শশিমোহনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। নতুন শাড়ির নক্ত ভাঁজের উপর দিয়ে আসন্ন মাহুটের আভাস বহিঃ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় না, তবু শশিমোহনের চোখ সেখানটার খেঁচে থাকে। ঐ তো ওখানটায় তেমনি ছোট্ট একটি মাহুট লুকিয়ে আছে, একদিন অমনি ক'রেই বেরিয়ে আসবে—ভয়াবহ সেই রাজের রূপ, রক্ত ও জীবনের ছবি শশিমোহনের চোখের সামনে ভেসে উঠে, মনে মনে বলতে থাকে, ভগবান যা শাস্তি দেবার আমাকে দাও, ওদের কোনো অমঙ্গল তুমি কোরো না।

পদ্মের কথাটা মনে পড়ে। এরও নাতিতে ওরকম পদ্ম আছে কিনা জানবার জন্য শশিমোহন কৌতুহল হয়। এ প্রশ্নটা আজও সে মুখ ফুটে কাকুর কাছে করতে পারে নি, কেমন একটা অহেতুক ভয়ে ও বিধায় জিব তার আটকে গেছে।

অমিতার ব্যাখা উঠলো একদিন দুপুর বেলায়। ব্যাখাটা এক-একবার উঠে কেবলই প'ড়ে যেতে লাগলো। সন্ধ্যার দিকে ব্যাপারটা রীতিমতো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

স্থাসিনী শশিমোহনের চোখের দিকে তাকাতে পারেন না,

শশিমোহনও তাকে দেখলেই স'রে যায়। একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবে এ তো তারা জানতোই।

আত্মীয়স্বজন ও পাড়ার প্রবীণ-প্রবীণায় বাড়ি ভ'রে গেলো। অবশেষে এলো ডাক্তার, সঙ্গে তার স্বল্পপাতি।

শশিমোহন প্রয়োজনের তাগিদে ছুটোছুটি করে, আর মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করে। গরম জল এগিয়ে দিতে গিয়ে একটা বস্ত্রের চেহারা দেখে সে আঁতকে উঠলো, ওটা দিয়ে কি করতে পারে ভাবতে গিয়ে ভয়ে মাথা তার ঝিমঝিম করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর জানা গেলো সন্তানটা বেঁচে আছে। কিন্তু সেটা বোধ হয় মৃত।

শশিমোহনের আন্তরিক প্রার্থনা বৃদ্ধ হয়ে গেলো। অমিতার হয়েও আর কোনো আবেদন জানাতে সে ভরসা পেলো না। কা'কে শান্তি দিতে হবে না-হবে তা নিয়ে তার মতো অপরাধীর উপদেশ ভগবান তুলবেন কেন! এ পাপের শাস্তি সে পাবে, স্বহাসিনী পাবে, এ-পরিবারের সবাইকে পেতে হবে।

এত বড়ো দুর্ঘটনার মধ্যেও সেই কৌতূহলটা তার জেগে উঠে। বীরে বীরে আঁতুড় ঘরের দিকে শশিমোহন এগিয়ে গেলো। ঘন ঘন ঘরবার করার দরুণ দরজা অনেকটা ফাঁক হয়েই ছিলো, শশিমোহন দেখতে পেলো স্বহাসিনী সেই রকম একটা রক্ত-পুষ্পের উপর তেমনি ক'রেই হুঁকে আছে, আর ডাক্তারবাবু মৃতশিশুর মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে পায়ে ধ'রে কাঁকছে। দ্বাই বেটি হাত নেড়ে বলছে, 'আহা, এমন ক'রে কেঁকো নি বাবু, আদা চিবিয়ে নাকমুখে হুঁ নাগালেই হবে—'

‘আর হয়োচ্চ, যেটুকু প্রাণ ছিলো, এ ঝাঁকুনিতেই গড ছেড়ে পালিয়েছে। এ তো আর মানুষে ঝাঁকছে না, ঝাঁকছে দৈবে।—শশিমোহন দরজার সামনে থেকে সরে এলো।—কিন্তু বউমা তাব ঠিকই বলেছিলো, গুরুকমই হয়। আতুড়ঘরে মানুষ তবে তার এ দেবতার মতো হয়েই দেখা দেয়। সেই দেবতার অভিশাপ লেগেছে—অকস্মাৎ খাস টানতে শশিমোহনের কেমন কষ্ট হতে থাকে, কেউ যেন তার নাকেমুখে জাপটে ধরেছে—

হঠাৎ মরা সন্তানটার কান্নায় শশিমোহনের অবশ চেতনা গা ঝাড়া দিয়ে চমকে উঠলো, এমন অবাক কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

যেয়েরা শাখ বাজালো, ঝাঁকে ঝাঁকে উলুধ্বনি করলো—মানুষ মানুষের সন্তানকে অভিনন্দন জানালো।

স্ট্রট-পর্য্য ডাক্তার খটখট শব্দে বেরিয়ে গেলো, শশিমোহন বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো। লেখাপড়া-জানা লোকগুলোর উপর যেন তার অসীম শ্রদ্ধায় ভ’রে উঠলো। বারা মরা সন্তান পেট থেকে টেনে বা’র ক’রে বাঁচিয়ে তুলতে পারে, ভগবানের অভিশাপকে বারা বার মানাতে পারে—তারা সব পারে—

কিন্তু এত বারা পারে তারা তার হুমিদিদির স্বধ-শান্তির—তার বাঁচা-ছেলেকটাকে কোলে তুলে নেবার একটা পথ ক’রে দিতে পারে না কেন।

মুখ শশিমোহন এর কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

ফাঁকি

মানের চলেনা কিছুই কিন্তু চালাতে হয় অনেক-কিছু, শুভেন্দু তাদেরই একজন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাড়িওয়ার মুখ থেকে শুনতে হয়েছে, ‘আপনার চলছে সবই, বত পোলমাল আমার ভাড়ার বেলার।’ মুদি বলে ‘সবই চলছে, চলে না শুধু আমার পাওনাটা।’ ছুখুলা, করলাওয়ার মুখেও ঐ একই কথা শুনতে হয় শুভেন্দুর—সবই বখন চলছে তখন তাদের পাওনা নিয়ে টালবাহানা করলে তারা মানবে কেন!

সব চলছে ব’লেই যেন তারা টাকা চাইতে আসে, নইলে বুকি তাকে রেহাই দিত! শুভেন্দু চুপ করে শোনে। বলে না কিছুই—কি-ই বা তার বলবার আছে।

খানোকা বিছানার ভোষকটা একবার উল্টে পাল্টে দেখে, জানে তলার কিছু নেই—ভব্। পুরোনো অভ্যাসের জের টানা। এক সময় পকেটের খুচরো পয়সাগুলো ছুড়ে দিতো বিছানার তলার, নেহাৎ কখনো-সখনো দরকার পড়লে ওতে হাত পড়তো।

ছুখার টাকাটার দু’দিন কোনোরকমে চলছে। টাকা দেবার সময় ছুখা সেদিন বলেছিলো আর নাকি একটা আমার পয়সাও রইলো না তার কাছে। ঠেকা-বেঠেকার জন্তে সাহায্য-কিছুও কি হাতে রাখে নি। অবন আরও তো ক’দিন বলেছে, এই শেষ—আর কিছু নেই তার হাতে।

কিন্তু সেদিনকার বলার ধরনটা ছিলো যেন একটু অস্তরকম, অবিশ্বাস হ'তে চায় না। তবু স্বধাকে সে ডাকে একবার জিজ্ঞেস করবার জন্যে।

স্বধা এক কোণে গোঁজ হ'য়ে ব'সে ছিলো। ভেজা চোখে এসে শুভেন্দুর সামনে দাঁড়ালো। ধানকরেক ঘুঁটের অভাবে বেচারী উলুনে আগুন দিতে পারে নি।

‘ঘুঁটের ঘোঁরায় মাহুকের চোখে জল আসে জানতাম, তোমার দেখছি উল্টো’—শুভেন্দু ক্যাকাসে গলার এরই মধ্যে একটু কৌতুক করে। ‘উলুনে আগুন দিলেই তো আর পেটের আগুন নিভবে না—তবিলে সামান্য-কিছু কি আছে?’ শুভেন্দু জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তাকালো স্বধার মুখের দিকে।

অবাবে স্বধা নীচের ঠোঁটটা উল্টে দিয়ে মুখ ফেরালো। হঠাৎ রাগ বস্তুটা শুভেন্দুর শিরা-উপশিরায় ছুটোছুটি শুরু ক'রে দেয়। ওরকম ক'রে ঠোঁট উল্টে অবাব দেবার মতো কথা এটা নয়। নেই, কোথায় সেটা ভালো ক'রে বলবে, কি করা যায় তা নিয়ে ভাবিত হ'য়ে উঠবে, তা না এসেছে দায় সারা অবাব দিতে।

তবিলের শূন্যতা নয়, উত্তর দেবার ভজিটাই যেন সে সইতে পারে না। তিক্ত মুখে ধমকে ওঠে, ‘সরো বলছি সামনে থেকে! কোনো-রকম উপকারে তো আসবেই না, অসময়ে বুদ্ধি ক'রে একটা কথা বলতে পর্বস্ত শেখোনি—অশিক্ষিত জানোয়ার।’

শুভেন্দু উঠে ধরের ভিতর পাইচারি করতে থাকে। ইচ্ছা হয় গলা ছেড়ে খুব খানিকটা গালাগাল করবে, ইচ্ছে হয় ধরের জিনিষপত্র ভেঙে তচনচ করতে; আবার এ কথাটাও শুভেন্দুর মনে উকি দেয়

বৈকি, কি এমন কারণ ঘটলো বার জন্মে সে এতটা রেগে যেতে পারে।

উপস্থিত কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনাই যে এর কারণ নয় সেটুকু বুঝবার মতো বিবেচনাশক্তি শুভেন্দুর আছে। এই রাগ, এতটা অত্যন্ত গভীরে যে কারণ, তার জন্মে দায়ী করতে পারে এমন একটি লোকও আজ তার আওতার মধ্যে নেই।

একদিন ছিলো যখন মাঝে মাঝে রেগে উঠতে শুভেন্দুর বেশ লাগতো। একটু রাগ করলে মন্দ হয় না, ভেবে নিয়ে হয়তো সে চ'টে উঠতো। বাড়ির সবার মুখে ফুটে উঠতো একটি ভাব, ধোকা রাগে না, রাগলে বড়ো ভয়ানক—বেশ উপভোগ করতো সে সবার মুখের ঐ শক্তিত ভাবটা। আজ সামনে আছে একমাত্র সূখ। রাগ করার উৎসাহটাও তার কাছ থেকে পায় না ব'লে ভিতরে ভিতরে সে আরও রেগে যায়। রাগে, দুঃখে ঐ একই রকম ভিজে-ভিজে চেহারা নিয়ে সূখার গুম্ হ'য়ে ব'লে থাকাকা সে যেন বরদাস্ত করতে পারে না।

ঘরের কোণে ছিলো একটা বেতের চেয়ার, বসতে গেলে যেটা চার পা ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। পাইচারি ধারিণে শুভেন্দু সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো; হঠাৎ হাতে তুলে নিয়ে দুমড়ে দুমড়ে সঁক করলো ভাঙতে।

সূখা ভয় পেয়ে শক্ত দৃষ্টিতে তাকায় শুভেন্দুর দিকে। শুভেন্দু কেঁপে গেলো নাকি, শেষপর্বন্ত মারধর করবে না তো! তা-ও কি সম্ভব শুভেন্দু তো তেমন লোক নয়—তবু ভয়ে সূখার কঁদে কেলতে ইচ্ছে হয়।

পদ্ম নাভ

শুভেন্দু চেয়ারটাকে টুকরো-টুকরো করলো, তারপর টুকরোগুলি পা দিয়ে ঠেলে দিলো স্বপ্নার সামনে। ‘বাও, উন্ননটা ধরিয়ে নেয়েটার ছুখটা অন্তত চাপিয়ে দাওগে, বাও। বুদ্ধি খরচা ক’রে বে একটা ব্যবস্থা করবে তা নয়, পারো শুধু চোখের জল ফেলতে।’

বুদ্ধির দৌলতে ঘুঁটের পরিবর্তে একটা ব্যবস্থা ক’রে দিয়ে শুভেন্দু বেরিয়ে পড়লো।

বেকারদের চরম অবস্থায় পদার্পণ করেছে এই প্রথম, তাই ভয় ও ভক্তভাটা শুভেন্দুর বড়ো বেশি ভীষ।

সারা সকাল ঘুরেও একটা টাকা শুভেন্দু যোগাড় করতে পারলো না। মাথার উপর রোদটা হ’রে উঠেছে প্রথম, আশায় ঘুরে বেড়াবার মতো ইচ্ছা ও উত্তম ছটোতেই তার তিলে পড়েছে। আপিলের সময় পেরিয়ে গেছে, বন্ধুবান্ধবও কেউ বড়ো একটা বাড়ি নেই, কা’র কাছেই বা আর বাবে! আন্তে-আন্তে সে বাড়ি কিরে এলো—এক পেলাস জল খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার না হয় চেষ্টা ক’রে দেখবে।

বাড়ি ঢুকে শুভেন্দু দেখতে পেলো রান্নাঘরের দোর খোলা, স্বপ্না তার পাশের-বাড়ির বন্ধুটির সঙ্গে ব’লে গল্প করছে। একপাশে প’ড়ে আছে ঝিটি আর তরকারির কুড়ি, ভাতের ডেক্‌চিটা উল্লনে চড়ানো, কিছুটা দূরে একটা খালার আর ছটো বাটিতে কি-সব ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

খুবই একটা নিশ্চিন্ততা ও রাগ নিয়ে শুভেন্দু গিয়ে খরে ঢুকলো।

নিশ্চয়ই স্বপ্নার কাছে পয়সা ছিলো, তার দেরি দেখে বন্ধুর বাড়ির চাকরকে দিয়ে কিনেকেটে এনেছে। তার ক্ষমতা স্বপ্না পরখ ক’রে

পদ্ম নাভ

দেখতে চায় নাকি ! নইলে তার কাছে পরলা থাকতে শুভেন্দুকে
রোদ মাখায় ক'রে দশজনের কাছে অপদহ হ'রে বেড়াতে হয় কেন !
অবিস্ত্রি আজ বাদে কাল এমনি ক'রে বেরুতে তাকে হবেই ; নিফলতা
অপমান, শারীরিক কষ্ট এসবও মেনে তাকে নিতেই হবে, শুভেন্দু
তা জানে, কিন্তু স্বধার এ মনোবৃত্তিকে কিছুতেই সে ক্কার চোখে
দেখতে পারে না ।

হয়তো এও হ'তে পারে স্বধার কাছে কিছুই ছিলো না, ধার
নিরেছে তার এই বন্ধুটির কাছ থেকে । এ চেষ্টাও তো সে আগেই
করতে পারতো । চেষ্টা না করুক, তার সাধের ভিতর এ একটা পথ
রয়েছে একটু জানিয়ে দু'টো কথা বললেও তো দুঃসময়ে মনে শুভেন্দু
একটু বল পায় । স্বধা হয়তো ভেবেছে খুব একটা বাহবা লুটবে তার
কাছ থেকে, আশ্রক সে, এই মুকন্নিয়ানার অবাবটা এবার ভালো
হাতেই পাবে ।

স্বধার সংগৃহীত অন্ন সে স্পর্শ করবে না, এটা শুভেন্দু মনে-মনে
স্মির ক'রে কেললো । সে না খেলে স্বধাও খাবে না—তা না থাক ;
এ নিরে একটা বোঝাপড়ার পর স্বধা চ'লে যাক তার ভাইয়ের কাছে,
তার কোনো আপত্তি নেই—তালো ক'রে একবার বুকে আশ্রক কষ্টই
বড়ো, না মানটা বড়ো ।

মাখার ভিতর একদল চিন্তা নিয়ে শুভেন্দু ঘরের মধ্যে পাইচারি
করছিলো এমন সময় স্বধা এসে ঘরে ঢুকলো ।

শুভেন্দু ধমকে ঠাড়িয়ে প'ড়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বন্ধু চ'লে গেছে ?'
'হ্যা—'

'বল, আর কিছু শুনতে চাইনে ।' তাপা কর্তৃক বখাসভব কই ক'রে

শুভেন্দু বলতে লাগলো, ‘এখন বলবে তো আজকের মতো ব্যবস্থা করেছে—বাও, চান করতে বাও। কিন্তু তার আগে—’

আশ্চর্য হ’য়ে স্থধা ব’লে উঠলো, ‘ব্যবস্থা হ’লে তো ও-কথা বলবো, আমি আরো তোমার অপেক্ষায়—’ কথা স্থধা শেষ করলো না। তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিলো একটু করুণ হাসি। ‘বাক, বন্ধুকে ঠিকই ঠকাতে পেরেছি, তুমিও যখন ধরতে পারো নি—’

‘তার মানে ?’

‘মানে আর কি—চুকবার সময় রান্নাঘরটা চোখে পড়ছে, না ?—যখন-তখন ও আসে গল্প করতে, তাই দু’একটা খালা-বাটি চাপা দিয়ে কেলে রেখেছি, তাতেই ডেক্‌চিটার জল ঢেলে বসিয়ে দিয়েছি উম্মনে, খালি-খালি জলবে—এতো বেলা হ’য়ে গেছে, ভারি লজ্জা করে—’

দেখতে-দেখতে দু’চোখ স্থধার জলে ভ’রে আসে, এলিয়ে-পড়া সেই স্নান হাসিটুকু তখনও তার ঠোঁটের কোণে।

আর শুভেন্দু—এত বড়ো একটা কৌতূহলের কথা শুনে তারও বৃষ্টি বা হেসে উঠতেই ইচ্ছে করে।

সত্তা

কলকাতায় পাশাপাশি বাড়িতে থাকাকাটা পরিচয়ের সূত্র কখনো হয় না—স্বধীরঞ্জনবাবুকে দেখি, তার হুঁচক কণ্ঠ শুনি কিন্তু মৌখিক পরিচয় হবার মতো কোনো কারণ ঘটে নি।

সেদিন সরাসরি আমার বসবার ঘরে এসে বসুন ঢুকলেন, একটু শঙ্কিত হলাম। পাশের বাড়ির মালিকের অনাহত আগমনের পিছনে প্রায়ই থাকে পড়শীর কোনো ক্রটিজনিত উদ্বেজন।

আমাকে ভদ্রতা করার স্বযোগ না দিয়েই স্বধীরঞ্জনবাবু আসন গ্রহণ করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। কারণটা অবাহনীর কিছু নয়। তিনি তার ভাড়াটে-মুখাপেকী গ্যারেজ-ঘরটার একটি মুদ্রির-দোকান খুলছেন, পাড়াপড়শীদের সহায়ত্ব চান। দোকান ‘প্রতিষ্ঠা’ হবে কাল, সে-উপলক্ষ্যে দস্তুরমতো ছাপানো একখানি চিঠি দিয়ে নেমস্কর করলেন। হঠাৎ মুদ্রির-দোকান কেন খুলছেন তার কারণও জানালেন। মেয়ের বিয়ের সঙা করবার সময় পাইকারি দরে জিনিষ কিনে তিনি আবিষ্কার করেছেন, নিত্য-দরকারি এই চাল-ডাল-মুন-তেলে আমরা দিনের-পর-দিন কী আশ্রয় ঠেকে আসছি। দোকানীরা সব নাকি ছোড়োর। যাতে তিনি নিজে এবং পাড়ার অন্তর্দণ্ডজন ভদ্রলোক সস্তার ভালো জিনিষ পেতে পারেন তারই জন্তে এ ব্যবস্থা। দোকান চলে ভালো, না চলে জিনিষ তো তাঁর ফেলা যাবে না।

ছুটো গাড়ির আলদা মস্ত গ্যারেজ-ঘরটার একটা কাণ্ডকারখানা চলছে, আসতে যেতে সেটা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু ওটা যে মুদির-দোকানের জন্ন-পর্ব তা ভাবতে পারি নি। পারা সম্ভবও নয়।

বললাম, ‘আমি তো ভেবেছিলাম ক্যাবিনেট ফারম খুলছেন।’

হেসে জবাব দিলেন, ‘মুদিখানা ব’লে কি মনে করেছেন বেটাদের মতো স্টিমি কিছু করবো। এ হবে একদম মডার্ন কায়দায়। বাংলাদেশে এমনটি দেখেন নি। আহ্ন না, দেখুন এসে কেমন সব ব্যবস্থা করেছি।’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ‘আহ্ন—চলুন দেখবেন, দেখে তারিফ না ক’রে পারবেন না।’

কাজ রেখে বাধ্য হ’য়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হ’লো।

প্রগীত হাসিখুশি লোকটি। দেখলেই মনে হয় মনে নিটোল একটা শান্তি আছে। দোকানে ঢুকেই সগৌরবে সবগুলো আসবাবের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ‘কেমন মুদিখানা ব’লে মনে হয়?’ মাটিতে শোরানো প্রকাণ্ড শো-কেসটা দেখিয়ে বললেন, ‘চিনি, ময়দা, ডাল, মশলা, সব ঝাড়পোছ ক’রে ঢেলে দেবো এর ষোপে-ষোপে—এই মস্ত কাচের জারটার থাকবে তেল, কলের মুখ খুললেই বস, নিট চ’লে আসবে বোতলে। দেখবেন মেয়েরা পর্বন্ত শব্দ ক’রে সওদা করতে আসবে। বাজার ঘুরে শাড়ি পাউডার কিনবে, বাড়ির পাখের দোকান থেকে নিজেদের ভাঁড়ারের জিনিস কিনবে না, স্টাইল নষ্ট হয় যে—’ একটু মুচকি হেসে বললেন, ‘এই দেখুন একটা বিলিতি কাঁটা কিনেছি, জিজ্ঞেস করবো, মূহুর ডাল ক’ পাউণ্ড—খুব একটা স্টাইল হবে, কি বলেন?’ স্বউচ্চ হাসি।

বুঝলাম উদ্দেশ্য ব্যবসা নয়, নেহাৎই খেলাল। একটা কিছু বলা দরকার, বললাম, ‘ভারি হুল্লর করেছেন কিন্তু দোকানটি।’

‘আরে মশাই হুল্লরটা বড়ো কথা নয়, কথা হ’লো এমনটি করতে খরচাটা কি করেছে। সেখানেই তো ক্রেডিট। বলুন তো দেয়াল-জোড়া এই শেলফ্‌টার দাম কত?’ টক-টক ক’রে শেলফের গায় টোকা মারলেন। ‘পরলানঘর টিক, সাহেববাড়ির জিনিস—বলুন?’ তিনি চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন। ‘পারলেন না তো! ওয়ান-টুয়ানটিকাইভ—কিনেছি কততে জানেন, ওনলি ফরটি। সমস্ত কলকাতা চ’বে আহ্নন, পারবেন না জোটাতে এ দামে—ইম্পসিবল।’

একে-একে কোন জিনিসটি কত সত্তার কিনেছেন বা করিয়েছেন তার পরিচয় দিয়ে গেলেন। বললেন, ‘ড্যাম চিপ-এ হ’য়ে গেল ব’লেই তো এত সব করা, নয়তো সত্যি কি আর স্টাইলের জন্তে করেছে। ওসব বাজে চালে আমি নেই মশাই।’

একটু পরেই যদিও মনে-মনে স্বীকার করতে হ’লো বাজে চালে তিনি নেই, কিন্তু উপস্থিত কথাটার সায় দিতে পারলাম না।

স্বধীবাবু ব’লে চললেন, ‘জিনিস কেনা মন্ত একটা আর্ট, ও সবার আসে না—জাক্ ধাকা চাই। আহ্নন, আপনাকে দেখাজি আর চ’একটা জিনিস।’

পিছন-পিছন বেরিয়ে এলাম। বাড়ির ভিতর ঢুকছেন দেখে ধমকে দাঁড়লাম।

স্বধীবাবু ডাকলেন, ‘চ’লে আহ্নন। পাশের বাড়ি থাকেন, আপনি তো ঘরের লোক। লজ্জা কিগের।’

পদ্ম নাভ

একেবারে উপর তলার তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে হাজির। বিশেষ আদর-আপ্যায়ন ক'রে বসালেন। খুবই মন খোলা লোক, গলাটি তার চেয়েও বেশি খোলা—সব সময়েই যেন হাজার লোকের উদ্দেশে কথা বলছেন। হাঁকডাক ক'রে মেরেকে দিয়ে একতাড়া চাষি আনালেন। পাশাপাশি সাজানো গোটা আটেক বড়ো-বড়ো হাঁক, পটাপট তাল খুলে ডালাগুলো তুলে দিলেন।

বললেন, 'বছর তিন আগে গিয়েছিলাম লাহোর আর কাশ্মীর। পরম কাপড় দেখলাম ড্যাম চিপ। আহ্নন এগিয়ে—এ সব কাপড়ের দর শুনলে আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না। অল্প মজুরিতে একটা ভালো দরজিও পাওয়া গেলো—এক সঙ্গে বেশি করালে দেখলাম আরও কম খরচা, পনেরটা কমপ্রিট স্ট্রট আর সাতটা ওভার কোট করিয়ে ফেললাম। জিনিষগুলো দেখে দামটা ঝাঁচ করুন, তারপর বলছি, আগে ফাঁস করবো না। ছ'টা ধানে এখনো হাত দেওয়াই হয় নি। এ ছুটো হাঁকে শুধু কাশ্মীরী শাল আর আলোয়ান।'

বললাম, 'গ্যাঙ্গিন ধ'রে আছি, আপনাকে কখনো তো স্ট্রট পরতে দেখিনি।'

'পরি নে, হয়তো পরবও না। সে কথা নয়, পারচেজটা কেমন হয়েছে তাই দেখুন। আমার ওয়াইকও বলেন, স্ট্রট তুমি পর না, এত টাকা খরচ ক'রে এতগুলো তৈরি করার দরকারটা ছিলো ক। আরে মশাই, খাটি দরকারের দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের বাটভাগ জিনিসই তো বাদ দিতে হয়—কি বলেন? এমন জলের মতো জিনিসগুলি পাচ্ছি, হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। মাথা খুড়লেও পারবো! আমি এখানে জোটাতে এ দামে।'

পদ্ম নাট

ব্যবসার বাইরে প্রয়োজন বা শখ ছাড়া এমন অভূত কারণেও যে মানুষ অর্থ ব্যয় ক'রে জিনিস কেনে, আমার জানা ছিলো না। এক বেলায় পরিচয়ে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে সায় দেওয়াটাই নিরাপদ। তা ছাড়া উপদেশরূপ বস্তুটি ওর মস্তিকে ঢোকবার অঙ্গে এতদিন যাবৎ আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে, এটা মনে করাও অবাচীনতা। একে একে অনেক জিনিস দেখে এবং সঙ্গে-সঙ্গে জিনিস-কেনার আর্টের তারিফ ক'রে প্রথম দিনের পরিচয়পর্ব শেষ করলাম।

পুরোনো দোকান ছেড়ে স্বধীরজনাবাবুর দোকানের গ্রাহক হলাম। ভালো জিনিস সস্তা দরে দেবার প্রতিশ্রুতিটা তিনি ঠিকই রাখতে লাগলেন। মাঝেমাঝে সাক্ষাৎ হয়, রাস্তার দাঁড়িয়ে দোকান সম্পর্কে প্রশ্ন ও গলা খুলে খানিকটা আলাপও করেন। অল্প দোকানীর চেয়ে অনেক কিকিরফন্টিতে সস্তায় মাল কিনতে জানেন ব'লেই যে আমাদের এত কম দরে দিতে পারছেন, নানা নজির টেনে সেটাই আচ্ছা ক'রে বুঝিয়ে দেন।

একদিন রাত দশটার স্বধীরজনাবাবুর মুক্তকণ্ঠনিঃসৃত আমার নাম শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

বললেন, 'নেবে আসুন মশাই, দেখুন এসে কী কাণ্ড করেছে।'

স্বধীরজনাবাবুর পিছনে ছ'সাতটা ফুলির মাথায় একটা বিরাট বস্তু। নেবে আসতেই অসাধারণ চেষ্টায় গলা একটু খাটো ক'রে বললেন, 'আমেরিকান পিয়ানো টিপটপ কন্ডিশান, নিউ প্রাইস হাজার টাকা—মাত্র তিনশো টাকায় কিনে নিয়ে এলাম।'

ফুলির প্রাবল্যে কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন। ফুলিদের উপর 'হার' সম্বলের হিন্দিতে বকাবকা ক'রে বিরাট বস্তুটিকে বাইরের

প দ্ব না ভ

ঘরে একপাশে বসালেন। আমাকেও বসতে হ'লো। তিনি নিজে এসেছেন রিকশাতে। রিকশাওলার মতে চার পরস্রা স্বধীরজনবাবু কম দিচ্ছেন। মিনিট পনেরো হজ্জা আর বিতঙার পর স্বধীবাবু 'নেই দেব্বা' ব'লে দরজার কাছ থেকে স'রে এলেন।

রিকশাওলা চারটে পরস্রার জন্তে যেমনই হজ্জা করছিলো, তেমনি আব্বার খুবই হঠাৎ হুকুমটা মেনে নিয়ে চূপচাপ বেরিয়ে গেলো। স্বধীবাবু সগৌরবে বললেন, 'আমার সঙ্গে চালাকি। মিথ্যে ব'লে চারটে পরস্রা ধেরে দেবার মতলব। কত সব ঘুমুলোক কাণাকড়াটি ঠকাতে পারলো না আর—' কথা বলতে বলতে দরজার বাইরের কোণটায় হাত দিলেন। 'আমার ছাতা ?'

ছাতা নেই। থোকা গেলো সেটা রিকশাওলাকে পুষিয়ে দেবার জন্তে তারই সঙ্গে গেছে।

'চুরি করলে আর কি করা যায়। ব্যাটারা পাকা চোর। আব্বার একটা ট্রাবল, নয়তো বেটাকে—যাক্গে।' স্বধীবাবু এগিয়ে এলেন।

এইমাত্র সাত শো টাকা লাভ ক'রে ফিরছেন। ছাতার কথাটি ভুলতে মুহূর্তও লাগলো না। গিন্নানোর সামনে ব'সে বেসরো টোকা দিয়ে আমাকে দেখাতে লাগলেন যন্ত্রটা কি আন্দাজ সুরেলা। তারপর তার ক্রয়ের ইতিহাস। শেষ ক'রে বাড়ি ফিরতে এগারোটা।

এর কিছুদিন পর একখানা পুরোনো স্ট্যানডার্ড গাড়ি দেখা গেলো দিন দুই ব'রে স্বধীবাবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে-ধরনের গাড়ি, হর্ন ছাড়া বার সব অঙ্গই আওয়াজ করে। নিশ্চয়ই এমন একটা মূল্য পেয়েছেন, না কিনে থাকতে পারেন নি। আস্তাবণে দোকান তাই চট মূড়ি দিয়ে ফুটপাথের গা ঘেঁষেই প'ড়ে থাকতে হলো। নতুন

পদ্ম নাট

মালিকের কাছ থেকে খুব ধানিকটা সেবা বর আদায় ক'রে দিন করেক পর কোথায় স'রে পড়লো বলতে পারি না। স্বধীবাবুকে এটা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করতে শুনিনি—জিত সম্বন্ধে বোধহয় নিজেরই সন্দেহ ছিলো।

একদিন বাড়ির ভিতর হ'তে নালিশ এল, দোকান থেকে ঠিক মতো জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। চিনি আছে তো ময়দা নেই, ময়দা আছে তো ধি নেই। স্বধীবাবুকে জানাতে গিয়ে বা ঘেঁষে এলাম তাতে বোকা গেলো আমাদেরই উপকারার্থে এই সাময়িক অস্থবিহার সূত্রপাত। সত্তার ভালো ব্যবস্থাত আমদানির জন্তে লোক পাঠানো হয়েছে গ্রামে, তবুসা ধি আর আটা আসছে বিহার থেকে, চিনির জন্তে জাভা না হলেও গুরুকর্মই একটা কিছু আয়োজন চলেছে। অতএব বৈধ ধরতে হবে।

কিন্তু বৈধ অধিক দিন রাখা গেলো না। রাখতে হলো রান্নাঘরের পাট গুঠাতে হয়। প্রস্ন ক'রে স্বধীবাবুকে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিলো না। দেখা হলেই পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতাম।

বিশেষ প্রয়োজনে কিছু দিনের জন্তে কলকাতার বাইরে যেতে হলো। কিরে এসে দেখি মুদিখানার নোংরা জিনিস গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দোকানটা পুরোনো আসবাবের দোকানে ঝাড়িয়ে গেছে। বিরাট বপুর পিন্নানোটোও এসে সঙ্গে জুটেছে। যার বা মূল্য আঁটা রয়েছে কপালে।

আমাকে দেখতে পেয়ে স্বধীবাবু ডাকলেন। ভিতরে যেতেই বলতে লাগলেন, 'কিনবি না বাপু সে তো জানি? মিছিমিছি বদনাম করিস্ কেন! দাম বেশি বেলা হয়েছে—বন্সেল।'

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে?’

‘আরে মশাই, এই পাশের বাড়ির লোকটা।’

স্বধীবাবুর মন ও মেজাজ যে বিশেষ ভালো অবস্থায় নেই দেখেই বোঝা গেলো। শোবার ঘরের ছ’একটা আসবাবও বখন দোকানে এসে ঝাড়া হয়েছে—পকেটে টান পড়েছে নিশ্চয়। অবস্থা ভালো হতে পারে, কিন্তু ঝেয়ালের ঝোঁকে যা ক’রে বেড়াচ্ছেন তাতে এটাই স্বাভাবিক। এমনিতে লোকটি বড়ো ভালো। মনে মনে ছুঃখ বোধ করলাম।

পিয়ানোটার দাম লেখা হয়েছে ছ’শো টাকা। প্রয়োজনের তাগিদে একশো টাকার লোকসানটা মেনে নিতে হয়েছে। খানিকটা সহ্যহুঁড়ি, কিছুটা শখ বা সস্তার সংক্রম থেকেই বললাম, ‘পিয়ানোটা বিক্রিই বখন করছেন, আমাকেই দিন।—কিন্তু আমার মনে হয় অপেক্ষা করলে এটার অন্তে ভালো দাম দেবার লোক আপনি পাবেন—এমনকি বেশ কিছুটা লাভ রেখেই ছাড়তে পারবেন।’

স্বধীবাবুর চোখমুখ উজ্জল হয়ে উঠলো। ‘না মশাই এর কদর কটা লোক বোঝে।’

মনে হলো হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। ভাবলাম, টাকাটা গিয়ে একুনি পাঠিয়ে দেবো।

স্বধীবাবু ব’লে চললেন, ‘দোকানে চুকে জিনিস না কিনে বেরিয়ে যায় তাতে বলবার কিছু নেই, কিন্তু দামটা যা ফেলেছি সেটা যে স্ল্যাপ্‌রিসিয়েট করে না, তাইতো আমার গা জ্বলে যায়,—আপনি বখন নিচ্ছেন, পাশের বাড়ির লোক, বান—দিলাম আরো পকাশ টাকা

পঞ্চ নাত

ছেড়ে। দেড়শো টাকা—হোয়াট এ প্রাইস! দশজনকে দেখিয়ে গৌরব ক'রে বলতে পারবেন।'

আনন্দে ও উৎসাহে স্বধীবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চাকর ডেকে তক্ষুণি পাঠিয়ে দিলেন কুলি আনতে। স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। সত্যায় কিনে যতটা আনন্দ ও গর্ব বোধ করেছিলেন, সত্যায় দিতে পেরেও সেই আনন্দ ও গর্ব তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু মনে করবেন না স্বধীবাবু, জিনিসগুলো কেন বিক্রি করছেন জানতে পারি?'

'আরে মশাই, পঞ্চাশ টাকা ক'রে বিবে বাচ্ছিলো, দুশো বিবে আমি কিনে রেখেছিলাম দেশে। গুনলাম লেবার ওখানে তারি চিপ যাচ্ছে। আমিটাকে কাজে লাগানোর এই সুযোগ। ঠিক করেছি 'কারমিং' করবো—কিন্তু টাকা পরসার একটু টানাটানি যাচ্ছে তাই—'

কথা শেষ হবার আগেই কুলি এসে পড়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।



লেডিজ সিট

ধার-করা গ্রামোফোনের মতো মা'র মুখের কাবাই নেই—চলছেই, শুধু তাই নয়, কাটা-রেকর্ডের মতো এক কথা একশো বাব 'খোঁকা তুই বিয়ে কর'। মা'র স্নেহ সন্ধাননে আটকা-পড়া অটুট শৈশবের মতো অটুট সঙ্কল নিয়ে আমিও জীবনের পঁয়ত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম শুধু এই ব'লে—তাক্ত কোরো না, বাজে কাজের সময় আমার নেই। নতুনত্ব বর্জিত প্রেম এবং প্রতি-উত্তর। শুরুতে তাই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নজীর টেনে উপহাস করতেও কম করেনি। কিছুদিন হলো আমার বয়সের সংখ্যাটা হিসেব করে তারা সব হয়ে গেছে নীরব। আমার সঙ্কল্পের সত্যতা সম্পর্কে তাদের সকৌতুক সন্দেহ আজ প্রকৃতই ঘুচে গেছে। কিন্তু বাইরের লোকের বিশ্বাস অর্জন করা যখন হয়ে গেলো, অন্তরলোকের বিশ্বাসে এল দ্বিধা। অনেকটা অত্যাশের বশে অস্বীকার ক'রে চলি, কিন্তু সেই অস্বীকারে পূর্বের জোর ও অন্তরের সায় যেন আর খুঁজে পাই না। নিজের এই পরিবর্তনটুকু শুধু উপলব্ধি করি, কিন্তু ধীরে ধীরে এ পরিবর্তন কেন আসছে তার কারণ তলিয়ে দেখবার চেষ্টা কখনো করি নি।

অর্থনীতির একটা সমস্তা নিয়ে দিন কয়েক বাবং বড়োই বিভ্রত হয়ে পড়েছি। কোনো রকমেই একটা মীমাংসায় পৌঁছানো যাচ্ছে না। দিনটা রবিবার। অর্থশাস্ত্রের এক সহকর্মী অধ্যাপকের সঙ্গে এ বিষয়ে

কিছুটা আলোচনা করবো মনে করে দুপুর বেলায় তৈরি হচ্ছিলাম বেকব ব'লে। না এসে অহরোধ করলেন, আমার হস্তপ্রার্থিনী একটি কুমারীকে দর্শন ক'রে ছুটির দিনটা সার্থক ক'রে তুলতে। দস্তরখতো ধমুকে উঠে ছাতা হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরের রোদ্দে টালিগঞ্জের জনবিরল রাস্তার ফুটপাথ ধ'রে এগিয়ে চললাম একটা 'বাস-স্টপে'র উদ্দেশ্যে। মা'র মুখ-ভাবটা মনে প'ড়ে মনটা ঝরাপ হয়ে গেলো। ভাবলাম, আঘাতটা ও-রকমে না দিলেও তো পারি—এর পর থেকে অস্বীকারই করবো, অপমান আর করবো না।

'বাস-স্টপে' পৌছে একটা গাছের ছায়ায় ছাতা ভর দিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম উল্টো দিকের গলি থেকে হনহন ক'রে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর বেশ কিছু পিছনে আধ-ঘোমটা দেওয়া একটি মহিলা এবং তাঁর হাত ধ'রে ছুটতে ছুটতে আসছে হ'গাত বছরের একটি ছেলে। ভদ্রলোকটির গতির সঙ্গে সমতা রেখে চলার আশ্রয় চেষ্টা থেকে শুধু বোকা যায় পশ্চাতের প্রাণী ছুটি তাঁর সহযাত্রী। একটিবার পিছনে পৰ্শ্ব না তাকিয়ে লোকটি বরাবর রাস্তা পেরিয়ে এসে আমারই মতো বৃক্ষছায়ে আশ্রয় নিয়ে মন্ত একটা হাঁপ ছাড়লেন। বুঝলাম উদ্দেশ্য এক। ভদ্রলোকের ঘরানাক্ত মুখে বিরক্তি আর চাপা ক্রোধের স্পষ্ট অভিব্যক্তি।

মহিলাটি ছেলের হাত ধ'রে এসে দাঁড়ালেন খানিকটা তকাতে। আধুনিক না হ'লেও পৌরাণিক হয়ে না থাকার কিছু চেষ্টা তার পরিচ্ছদের মধ্যে ধরা পড়ে। পায়ে এক জোড়া ধূসি-মলিন স্তান্‌ডেল। পুরানো লজ্জা নতুন ঘোমটার সামান্য দেবার চেষ্টায়, ডান দিকে ঝুলেপড়া আঁচলটাকে বা দিকে এতটা টেনে ধরা হয়েছে যে মুখের

পদ্ম নাভ

অধেকটাই গেছে ঢেকে। চেষ্টা ও সুবিধার অভাবে মুখখানা ভালো ক'রে দেখা হয়ে উঠলো না।

মহিলাটি এসে দাঁড়াতেই ভজ্রলোক দাঁতে দাঁত চেপে জুঁজ চাপা কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—কেন গিছু গিছু আসছো? বাবার টাকা আছে তোমার, তারই কাছে থাকগে বাও, আমার কাছে স্থান হবেনা—নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার!

ব'লেই পুনরায় জোর হাওয়া ধেতে শুরু ক'রে দিলেন। গলা চেপে বলায় চাপা পড়লো না কিছুই; শুধু প্রকাশ পেলো তাঁর শেব কাণ্ডজ্ঞানের নিষ্ফল চেষ্টা। উভয়ের সম্পর্কটা সহজেই আঁচ করা যায়। কিন্তু দিনচুপুরে রাত্তায় তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে স্বামীর এরূপ ক্রোধ-প্রকাশ এবং নির্লজ্জের মত নির্লজ্জ ব'লে গালিগালাজ, নিজেদের কানে না শুনলে বা নিজের চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না।

জীবন ভরফ থেকে কোনো অব্যব এল না। আমার উপস্থিতিটাই হয়তো তার কারণ। স্বামীর প্রতি একটা জুঁজ কটাক্ষ করতেই তিনি আরও জ'লে উঠে অভিনয়ের ভাষায় বললেন—রাষ্ট্রদ্রোহী মতো তাকিও না—অনেক রক্ত চুষে খেয়েছো, আর দিচ্ছিনে, এই শেব—

লোকটির ঘেহের দিকে তাকালে কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। যুহুঁচ চুপ ক'রে থেকে তিনি দাঁত বিঁচিয়ে ব'লে উঠলেন—বাগের বাড়ি প'ড়ে থেকে ওয়ই সবে ভিঁকি করগে হাও—বাসকল।

জীকে বার সঙ্গে ভাব করার অসুবিধা দিয়ে স্বামী শেব বিদায় নিচ্ছেন তার ইতিহাস আমার জানা নেই; কিন্তু দাম্পত্য কলহের যে অংশটুকু আমার সামনে ঘটলো, সেটুকুই এত কুংসিত যে সেখানে

প ণ্ন না ভ

দাঁড়িয়ে থাকতে পর্যন্ত অস্বস্তি ও লজ্জা বোধ করছিলাম। চার-পাঁচ মিনিটের অভিজ্ঞতায় অবিবাহিত জীবনকে সমর্থন করার যেন মস্ত একটা যুক্তি খুঁজে পেলাম। ভাবলাম, এই তো হয়।

ব্যাপারটাকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে দেখতে দেখতে একটা বাস জরতগতিতে এসে হুমড়ি খেয়ে আমাদের সামনে থেমে পড়লো। উঠে একটা সিটে গিয়ে বসে পড়লাম। ভ্রমলোকটি আর একটা বেঞ্চিতে জানলা বেসে বসে তার ক্রেমের উপর রাখলেন হাত, হাতের উপর রাখলেন মাথা। জীলোক দেখে বাস তার মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রে একদম দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। ব্যস্ত হয়ে কণ্ডাকটর বললো—চলে আহ্নন—জলদি! জলদি তো দূরের কথা, মহিলার তরক থেকে আসবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তিনি যেমন ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কণ্ডাক্টর ঠং ঠং দুই বন্টি মেরে দিতেই বাস ছেড়ে দিলো। জীপুয়কে সত্যি সত্যিই রাস্তায় এমনভাবে ফেলে বাবে ভাবতে পারি নি। ইচ্ছা হলো লোকটার গালে একটা চড় ক'বে দিয়ে নেবে পড়ি, তারপর পৌছে দিয়ে আসি ঙ্গের, যেখানে ঙ্গরা যেতে চান। বাস শুদ্ধ কোতুহলী হ'য়ে ভ্রমলোকের দিকে, এবং মাথা ফিরিয়ে মহিলাটির দিকে বার-বার তাকাচ্ছিলো। জানালা দিয়ে পিছনে তাকাতেই দেখতে পেলাম মহিলাটি হাত তুলে দাঁড়াতে ইসারা করলেন। কণ্ডাক্টরও সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই চেয়ে ছিলো, ঠুং ক'রে একটা বন্টি দিয়ে বললো, একদম্ রোকুকে।

ছেলের হাত ধ'রে জন্তে এসিয়ে এসে মহিলাটি বাসে উঠলেন। ভ্রমলোক টক্ ক'রে জানলার ধারের সিটটা ছেড়ে এমনিভাবে পথ ক'রে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যেন এই কথা ছিলো। তারপর জীপ পাশে

পদ্ম নাভ

বেশন ক'রে বসলেন, মনে হলো একটা ছেদ টেনে দিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রইলেন বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে।

চলতি বাসে ব'সে আছি। চোখের উপর দিয়ে অর্ধশূন্য ভাবে ভেসে বেতে লাগলো স্বত সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপন, আর মনের উপর দিয়ে ভেসে বেতে লাগলো গুজ্জার এলোমেলো চিন্তা। বিবাহ এবং সমাজে নারীর স্থান থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংস্কৃতি কোনটাই তার মধ্যে বাদ পড়লো না।

একটা ষ্টাণ্ডে এসে বাস ধামলো। কণ্ডাক্টর হেঁকে বললো—
লেডিজ সিট ছেড়ে দিন।

একটি তরুণীকে আমার বেক্সির কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে বুঝলাম আদেশটা আমাকে উদ্দেশ্য ক'রেই দেওয়া হয়েছে। উঠে পিছনের বেক্সিতে গিয়ে বসলাম। একটি যুবক তরুণীটিকে নিয়ে বেক্সিখানা জুড়ে বসলেন। তরুণীটি স্বন্দরী এবং বিবাহিতা। তাদের ক্ষীণ কণ্ঠের ছ'একটি কথা কানে আসতেই বুঝলাম সন্দের যুবকটি তার স্বামী।

তরুণীটি আসার পরেই বাসের লোকগুলি বেন হঠাৎ হয়ে উঠলো চঞ্চল ও মুগ্ধ। উপস্থিত বা ভবিষ্যতে কোনো আশা নেই, তবু চুলগুলো বার কপালের উপর এসে পড়েছিলো, দিলো পিছন দিকে ঠেলে, কেউ সার্টের কলারটাকে দিলো উটে, কেউ নিচের ট্রোটের একটা কোনকে বাঁকা ক'রে দাঁত দিয়ে চেপে গভীরভাবে শুরু করলো পা নাচাতে।

ঠিক পিছনে বসেছি ব'লে স্পষ্ট স্তনভে পেলান যুবকটি আন্তে আন্তে বলছেন—ছ'দিন তো লাগলো অভিযান ভাঙতে—এ ভাবে দিনগুলো নষ্ট ক'রে লাভ কি?

পদ্ম নাভ

তরুণীটি কোনো জবাব না দিয়ে তাকালো বুকেরটির চোখের দিকে। কি এক বেশার আজুর উত্তরের দৃষ্টি। আমার প্রাণেও এসে যেন জঁর হোঁরাচ লাগলো। আর একটু হ'লে বুঁকি-বা একটা দীর্ঘশ্বাসই ছেড়ে দিতাম। পাশে চেয়ে দেখি পুরাতন দম্পতি তখনও বসে আছে উল্টোউল্টি তাকিয়ে।

পদ্মবাস্থানে বাস এসে পৌঁছলো। নামতে বাচ্ছি, শুনলাম কণ্ঠাকন্ঠর বলছে—পথ ছাড়ুন, মেয়েদের উঠতে দিন।

মাস উইধ কেয়ার—একপাশ বেসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পথ ছাড়া, গিট ছাড়া নিরে জুলুমটা যেন সব আজ এসে পড়ছে আমার উপরেই। কোনো কিছুই যে আমি ছাড়ছি নে, বমক দিয়ে সেটাই যেন জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাকে।

রঙিন কাপড়ের বেঁটে ছাতা হাতে প্রথম প্রবেশ করলো যে তরুণীটি তাকে অভ্যস্ত কুবাকী বললেও অভ্যক্তি হয় না। শাদা ঘরির পাড়টা নতুন বরনে দেহকে ঘিরে পা থেকে স্পাইরেলের মত বেয়ে উঠেছে কাঁধ পর্যন্ত। যল কাপড়ের দামী ব্লাউসটা বুকেরদের ব্যগ্র দৃষ্টির বিপক্ষে সগর্বে শ্রদ্ধা করতে না পেরেই যেন ক্ষুভাবে নেতিয়ে পড়েছে তার বুকের উপর। পিছনে বেঁটি উঠলো, পরিচ্ছন্ন থেকে দৃষ্টি কেড়ে নেয় তার স্বাস্থ্য ও রূপ।

নামতে গিয়ে নামা হলো না। দশ বছর পূর্বের দৃষ্টি ও মন যেন নতুন ক'রে কিরে এসে জন্ম ক'রে বসেছে আমাকে।

বাসের স্টাট নেওয়ার বাচ্চা লামলাতে না পেরে পিছনের তরুণীটি পড়লো এসে আমার গায়। সামলে উঠে একবার আমার দিকে তাকালো—হরিণাকী না বললেও 'হরণাকী' তাকে বলতেই হয়।

পদ্ম নাভ

পরের 'স্টেপে' চট ক'রে নেবে পড়লাম। হঠাৎ নিম্নের এত কড়ড়া একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। বহুদিন হয়ে গেলো এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটা সজাগ কখনও হয়েছি ব'লে মনে পড়ে না।

এককালে অর্থ রোজকারের প্রতি লোভটা ছিল প্রচুর। একদিন যখন টের পেলাম অর্থের চেয়ে অর্থনীতিতেই আনন্দ পাই বেশি— স্থির ক'রে ফেললাম সকল অভাবকেই তুচ্ছ ক'রে চলবো এই এক সম্পদকে সম্বল ক'রে। জ্ঞান-বুদ্ধির ধোঁরাকে টান না পড়ে এমনি ক'রে মনের আনাচ-কানাচ পর্বস্ত ভরিয়ে রাখবো অর্থনীতির তথ্য দিয়ে। কিন্তু আজ যেন বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম, মন ছাড়াও আর একটা বস্তু আছে যাকে বুঝিবা তুচ্ছ করা চলে না।—

ধীর পদক্ষেপে ফুটপাথ ধ'রে এগিয়ে চলেছি। চিন্তার লক্ষণস্বরূপ একটা হাত ধীরে ধীরে উঠে চিবুক স্পর্শ করতেই ঝাঁতকে উঠলাম। মনে হ'লো যেন হাতটা গিয়ে ঠেকলো একটা সুইপারের ব্রুসে। একে একে সমস্ত পল্লিচ্ছদটার দিকে নজর পড়লো। কলেজে পড়বার সময় পর্বস্তও দস্তরমতো বিলাসী ছিলাম ব'লেই মনে পড়ে। সে-সব শব্দ যেন কি ভাবে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আধময়লা পাঞ্জাবিটার উপরের পকেটে ক্রমালের স্থানটা জুড়ে আছে কয়েকখানা পুরানো চিঠি। তিন পয়সা মূল্যের পোস্টকার্ডটাই তার মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল, আত্মগোপন না ক'রে মাথা উচু ক'রে আছে সেটাই। নিচের একটা পকেট খালি, অলুটার মধ্যে ঢাকা-পয়সা থেকে শুক ক'রে বিস্তর কাগজপত্র—কলে জামার একটা কাঁধ পড়েছে বিচ্ছিন্নি রকমে স্থলে। জুতোটার সর্বাঙ্গ কীর্তন করছে মূর্চীর মহিমা। ছাতাটা বিরাট

পদ্ম নাভ

স্নানান্তে শিথিলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তার আকাশমুখো মস্ত হাঁ দেখে মনে হ'লো যেন বত জল সবই নিরর্থক ব'রে গেছে তার পিঠের উপর দিয়ে, বুক জোড়া তার বিরাট তৃষ্ণা; জোর ক'রে মূখ বুজে স্মার্ট হ'রে চলার ক্ষমতা তার হারিয়ে গেছে। কি ভেবে ছাতাটাকে জড়িয়ে ফেললাম ডাটের সঙ্গে, এঁটে দিতে গিয়ে দেখি স্ট্রাপটা নেই।

পরিচ্ছন্ন থেকে মনটা ছুটে গিয়ে মুহূর্তে একবার প্রদক্ষিণ ক'রে এল আবার শৃঙ্খলাহীন নোংরা ঘরটাকে। নিজের সম্পর্কে সকল বিষয়ে এতখানি অবহেলার ভিতর উদাসীন মূখ পেলাম না, বা পেলাম সে একটা একটানা শ্রান্তি, একটু প্রেরণার অভাব। বিত্যাচর্চা বা বয়স কাউকে দায়ী করতে পারলাম না বয়সের কথা মনে হতেই তারিণী ঠাকুরদার চতুর্থপক্ষ এহণের সাজ-পোষাকটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

বাঙালী-জীবনের সঙ্গী শ্রেষ্ঠাংশটুকু জোর ক'রে এড়িয়ে এসেছি ব'লে সত্যিসত্যিই আজ দুঃখ হ'লো। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে কানে বেজে উঠলো কণাকটারের সেই জোর গলায় হাঁক, 'লেডিজ সিটটা ছেড়ে দিন মশায়।'—

মুহূর্তে ঠিক ক'রে ফেললাম, ছেড়েই দেবো, বসাক এনে মা বাকে খুশি।



মেয়ে-স্কুলে একজন মাস্টার চাই। রমেন এসে বলে—দাওনা একটা দরখাস্ত ছেড়ে, স্যান্টিসেপ্টিক তো হয়েই আছে। সাদি করি নি, না হয় সাধ বে না যায় তা নয়। মাডোয়ারীকে দেখে আঁচ করা যায় না তার কত ঢাকা, তোমারও ভেঁমনি, চেহারায় ধরা পড়ে না তেভরের ভাব বুদ্ধি—লেগে পড়, হয়ে যাবে।

চুপ ক'রে শুধু হাসি। আজ পাঁচ বৎসর, পণ ক'রে পণ্য জ্বাষ হয়ে চাকরির বাজারে পড়ে আছি—, দরখাস্ত একটা দিই।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ডাক আসে। ছ'জন উমেদার, যোগ্যতা ছ'য়েরই সমান। আমাকেই পছন্দ করে, বোধ হয় চেহারার গুণে। বলে আসবেন কাল থেকে। অপর লোকটি বিফল হয়ে যাবার সময় একটা খোঁচা দিয়ে যায়। বলে—বেশ ভালো ব্যাকিং ছিলো, আমার দিকে তাকিয়ে ওরা ওঁদের মেয়েদের দিয়ে ভরসা পেলো না বোধ হয়। বাক—চাকরিটা পেলো কিন্তু পুরুষদের গৌরবটা তো বজায় রইলো। অস্ত্রদিকে মুখ ফিরিয়ে যেতে যেতে বলি—এখানে ছুটে এসেছি বজায় রাখতে অস্তিত্ব, পুরুষত্ব নয়।

বাড়ি ফিরে আসি। স্বরমা গুনে খুশিই হয়, তবু মনে হয় তার মধ্যে বেন একটু 'তবে' আছে। স' পাঁচ আনা খরচ ক'রে হরির লুট দেয়। চাবি শুদ্ধ আঁচলটাকে গলার জড়িয়ে তুলসী-মঞ্চের সামনে গড়

পদ্ম নাভ

হ'রে হরির উদ্দেশে প্রণাম করে—বোধহয় প্রার্থনা করে আমার চাকরি
ও মন দু'টোর উপরই একটু নজর রাখতে।

স্কুলে বাই, হেডমিস্ট্রেসের দিকে তাকিয়ে একবার একটু দেখে
নিরে হাত তুলে নমস্কার জানাই। কিঞ্চিৎ স্থূল, কিন্তু তা ব'লে দেখতে
নেহাৎ মন্দ নয়, তবে কাকুর ভালবাসার পাজী ব'লে ধারণা করা যায়
না। মুখ ও স্বর শ্রুপদের মতো গভীর। বলেন—অঙ্কের ক্লাস নিতে
হবে, বহন ওখানে, কেরানী বাবুকে ব'লে দিচ্ছি ফটিনটা ক'রে দিতে।

ক্লাসে বাই। গণিতের ভাণ্ডার নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন
পরিমাণ বিতরণ ক'রে বেড়াই। পড়াবার সময় বিশেষ ক'রে কারো
দিকে বড়ো একটা তাকাই না, দৃষ্টিটাকে চালিয়ে দিই সকলের মাথার
উপর দিয়ে। বয়েসটা অল্প, সব রকমেই সাবধান হয়ে চলি। কি
করতে কি করবো, ব'লে সববে উৎসাহের আভিষ্য।

স্বপ্না বলে—কামিয়ে যাও মুখটাকে, খোঁচা-খোঁচা লাড়িতে যে
ছেয়ে গেছে। তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর করি—ধাক আছ, কাল
রববার কালই কামাবো। শেষ পর্যন্ত তার অস্বরোধ না এড়াতে
পেরেই যেন কামিয়ে বাই।

স্থূল থেকে কিরে শ্রান্ত দেহটাকে ভাঙা ইঞ্জি-চেয়ারে এলিয়ে দিই।
স্বপ্না জলখাবার সামনে দিয়ে থুটিনাটি কত ধবরই না ভিজ্জেস করে।
হঠাৎ প্রশ্ন করে—আচ্ছা তোমার সব ছাত্রীই আমার চাইতে সুন্দর,
না? বলি—অত খেয়াল ক'রে তো দেখি নি। তোমার চেয়ে সুন্দর
হলে চোখে ঠেকতো হয়তো। স্বপ্না বিশ্বাস করে না, তবু খুশি হয়।

তৃতীয় শ্রেণীতে ক্লাস নিতে বড়ো অস্ববিধে হয়। পাশের ক্লাশে
মিস্ দত্ত ইংরিজি পড়ান। শিক্ষয়িত্রীর অসংখ্য ভুল, ছাত্রীদের অশ্রান্ত

পদ্ম নাভ

কোলাহল কানে এসে পৌঁছয়। বোর্ডে লিখতে লিখতে বেঁবে পড়ি ; একবার মনেও হয়, বাই, অহরোধ ক'রে আসি গণ্ডগোলটা ধামাতে। আবার ভাবি, আনন্দ-লোক থেকে এসেছে বার আমন্ত্রণ, এ কাজে এসেছে বার প্রাস্তি, শাস্ত করবার কঠোরতা সে পাবে কোথায় ? আর বাচ্ছেনই তো চ'লে মাস দুই পরে এই ব্যর্থতার হাত এড়িয়ে জীবনটাকে সার্থক ক'রে তুলতে।

এক এক দিন এসে তিনি বলেন—চপলাদির মত আছে,—দয়্য ক'রে যদি আমার ক্লাসটা—মাথাটা কেমন বেন করছে। মনে মনে বলি, মাথাটা না মনটা। কিন্তু অমত করিনে। ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে ক্ষত চ'লে যান গেটের দিকে। আবার ফিরে এসে বলেন,—দেখুন না কি অন্তায় আমার, একটা ধন্যবাদ পূর্বস্ত জানিয়ে যেতে ভুলে গেছি। সত্যিই আপনি ইয়ে না করলে—কৃতজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়ে ওঁর ছুটির প্রয়োজনীয়তা। কে একটি বুক গাড়িতে ভুলে নিয়ে চ'লে যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাই। প্রথম দিন নামের তালিকা খুলে ডাকতে ডাকতে বেঁবে পড়ি ; নামটা বিশেষ ক'রে নজরে পড়ে, ডাকি—বুলাকি সেন ! দাঁড়িয়ে বলে—উপস্থিত। একবার তাকিয়ে দেখি, নিজের চোখও বেন ব'লে উঠতে চায়—‘উপস্থিত’। ফুট-ফুটে রং, টানা-টানা চোখ, লাভণ্য আর দুইনি বেন মাখামাখি হয়ে ছেয়ে আছে মুখ-খানিকে। দু'পাশ দিয়ে লম্বা দু'টো বিহুনি খুলে পড়েছে ঠিক ইরাণী-দের মতো। নামের তালিকার মতো ওখানেও চোখ বেঁবে পডতে চায়, জোর ক'রে নাবিরে আনি। সমষ্টিতে লক্ষ্য ক'রে পড়াতে শুরু করি, পেরে উঠিনে। বুলাকি বড়ো চঞ্চল, সকলের মধ্যে সে হারিয়ে যায় না। বাধ্য হয়ে তার সত্তা আমাকে স্বীকার করতে হয়।

অঙ্ক কবতে দিই। মীরা নাকি হুঁরে বলে—দেখুন না মাস্টার মশাই, বুলাকি কি সব বলছে? বলে তোর ওপরের চোঁটটা সেকেও অ্যাক্টের মতো।

জিজ্ঞেস করি—তোমার অঙ্ক হয়েছে বুলাকি?

মীরা ফস্ ক'রে বুলাকির হাত থেকে খাতাটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখে যায়। খোলা পাতাটার উপর তাকিয়ে দেখি লেখা রয়েছে, 'অন্ধকার মুখটা সিম্পলিফাই করলে সব মিলে গিয়ে ফল হয় ডবল শ্রুত, সে ছুঁটো ওর চোখ। ক্লাস রুম থেকে মাস্টার মশাই বাদ গেলে থাকে শুধু মেয়েরা—উঃ কি মজা।'—এমনিধারা কত কি ছেলেমানুষি কথা। রাগ হয় না বরং হাসি পায়। তবু গভীর হয়ে বলি—রইলো খাতাটা, হেডমিস্ট্রেসকে দেখাবো। বুলাকির চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে। বাবার সময় খাতাটা দিয়ে ব'লে যাই, ভবিষ্যতে এমন হলে মাগ করবো না।

পরের দিনও তেমনি। দুইমি তার লেগেই আছে। বুলাকির দিকে নজর না দিতে চেষ্টা করি, মন ও চোখ ব্যাপ্তি ঘুচিয়ে বিশেষ কোথায় যেন আশ্রয় খোঁজে। শ্রেণীর গ্রন্থন গেয়ে সাহানা, সাহানারই মতো করুণ তার মুখ, রং তার খুবই ময়লা, স্ত্রী তাকে কোনো রকমেই বলা চলে না। তারই কাছে গিয়ে দাঁড়াই, পরিচয় করি, তারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে পড়িয়ে চলি। দিন যায়, সবাই বলে, সাহানা আমার প্রিয় ছাত্রী—কেউ তা'তে অপরাধ নেয় না।

হেডমিস্ট্রেসের কাছ থেকে ডাক আসে। তেগনি ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে দাঁড়াই। আদেশের হুঁরে বলেন—কেরানীবাবুর বড্ড কাজ পড়েছে, অবসর সময় ঐকে এসে একটু সাহায্য করবেন।

পদ্ম নাট

স্নেহ ভালবাসাঃ বাইরে মেয়েদের কাছে থেকে আদেশের সুরটা কেমন বেন খাপছাড়া ঠেকে। রাজি হ'য়ে ফিরে আসি।

টিফিনের সময় বারান্দার বেঞ্চির উপর ব'সে থাকি। সামনের খোলা জায়গায় কত মেয়ে ছোটো-ছোট করে। কতক ঘুরে বেড়ায়, কতক বা এখানে ওখানে দল বেঁধে ব'সে গল্প করে। বেশ লাগে দেখতে, বেন তুচ্ছ বুনো ফুলের এক একটা গুচ্ছ। বিশেষ ক'রে কারুরই সস্তা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না, তবু সবাই মিলে তারা বেশ সুন্দর হয়ে উঠে। খানিকটা দূরে জামকল গাছের নিচে বডো মেয়েরা বসে অবিশ্রাম কণা ব'লে চলে, ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করি এর মধ্যে প্রোতী কে। ভাবি, নারী ও নীরবতার দ্বন্দ্ব আজও ঘুচলো না।

বুলাকি কোথা থেকে স্রাণালটাকে চট-পট করতে করতে করতে ছুটে আসে। দারোয়ানকে বলে—দাওতো এক পয়সার কুল। কুল-গুলি মুঠো মুঠো গলার কাছ দিয়ে সেমিজের মধ্যে গলিয়ে দেয়। বা হাতের চনের উপর একটা কুলকে বার দুই জোর ক'রে টিপে টপ ক'রে মুখে ফেলে। তার পরেই গালের কাছে হাত নিয়ে নাক কুঁচকে নুখটাকে একটু ফাঁক ক'রে বলে—বাক্সাঃ কি টক! আবার খেতে থাকে, মুখের ভাবে ধরাই পড়ে না টকস্বর্ষটুকুলের দোষ না গুণ।

একটু কথা বলতে ইচ্ছে হয়। ডেকে বলি—টক কুল খেয়ো না, কাসি হবে যে।

দাঁতে দাঁত চেপে মুখে তৃপ্তি-সুচক শব্দ ক'রে জবাব দেয়—অমন কত খাই কিচ্ছু হয় না আমার। আচ্ছা মাস্টারমশাই, অক কবুতে আমার মোটেই ভালো লাগে না কেন বলুন তো? দেখবেন, এবার অক পাবো আমি শূণ্ডি।

পদ্ম নাট

দেখবার আগেই এ সত্য আমি মনে মনে স্বীকার করি। মুখে বলি—একটু মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করলে সেয়ে নেবার ঢের সময় আছে এখনো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে ঝাঁকটা একটু বেশ বেশি বোধ করি। মাঝে মাঝে বুলাকি স্থলে আসে না, বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়, পড়াতে আর তেমন উৎসাহ পাইনে।

ভূগোলের টিচার বদনবাবু এসে বলেন—কি নাথটাই না করেছেন স্থলে। টিচার স্টুডেন্ট সবাই বলে এমন লোক নাকি হয় না। নোটশ পেয়েছেন নিশ্চয়, থাকবেন তো আজ টিচার মিটিং-এ?

সভাব চরিত্রের প্রশংসায় আমার কায়েমী স্বভাব, স্তন্যতে স্তন্যতে গিয়ে গেছে, নতুন ক'রে আনন্দ দেয় না।

ছুটির পর সভা বসে। স্বজাতিদের পাশে গিয়ে ব'লে পড়ি। অপর দিকে ছুটো বেঞ্চে বসেন মেয়ে-টিচাররা মনে মনে ভাবি, হতো যদি এটা সন্ন্যাস-সভা ছ' পক্ষই থাকতো চোখ বুজে। আমাদের বেছে নিয়েছে কমিটি, ওদের সুনির্ভারশিটি। ছ'একজনের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় কোনো দিন একটু ছিলো, বোধহয় শুধে নিয়েছে বইয়ের পাতায়, ফিরিয়ে যা দিয়েছে তাই থেকে মাসে এই তিরিশ টাকা। ব'লে ব'লে সাময়িক একটা ঔদাসীন্য আসে, অন্তত তখনকার জন্তে মনে হয়, ছুনিয়ায় এরই জন্তে এত।

বেতন বৃদ্ধির আবেদন নিয়ে এই সভা—স্থির একটা কিছু হয়।

ক্লাশে বাই বুলাকি এসে বলে—আমার প্রাইভেট টিউটার চ'লে গেছেন, আপনি যদি পড়ান তো বেশ হয়। অঙ্কে তা হ'লে আমি নিশ্চয় পাশ করবো।

পদ্ম নাভ

বুলাকি আগ্রহ নিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করে। রাগি হ'তে গিয়ে খেমে পড়ি। বলি—বলবো কাল। কত কি ভেবে নিবেদ ক'রে দেওয়াই ঠিক করি।

স্থল থেকে ফিরে বাড়িতে ব'সে থাকি। স্বরমা এসে বলে—কই আজকে বেরুলে না যে ?

বলি—থাকনা, বরং সে-সময়টা তোমার সঙ্গে ব'সে গল্প করি। স্বরমা চেয়ারের হাতলটার উপর ব'সে মাথার চুলগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে কত কথাই না ব'লে চলে।

একটু ঘেন বেশি আদর করি। কে জানে স্বরমা টের পায় কিনা। কথায় কথায় ব'লে ফেলি—বিশ টাকা মাইনেতে একটা 'চ্যুশনি' পাই, নিবেদ ক'রে দেবো ঠিক করেছি।

স্বরমা আশ্চর্য হয়ে মুখের দিকে তাকায়। ঠাট্টার স্বরে বলি—স্বন্দরী মেয়ে—কি জানি, বলাভো যায় না।

শুনো কি একটু ভেবে নিয়ে মুখ ভার ক'রে স্বরমা জবাব দেয়—বেশতো তাই যদি হয়, থাকবে স্বধে, আমি তাতে বাদ সাধতে বাবো কেন ?

চিবুক ধ'রে আদর ক'রে বলি—তাইতো ভাবি, ভুলতেই এই।

মাথাটা কাঁধের উপর এলিয়ে দিয়ে উত্তর করে—তা—বুঝি, এমন দেবতার মতো মানুষ দিয়ে কাকুর বুঝি ভয় হয় আবার। বলি—দেব চরিত্রের ইতিহাসে এমন ব্যাধি দুর্ঘটনার নজির খুল নয় স্বরমা!—স্বরমা ও নিজেকে এক সঙ্গে ভরসা দিতেই যেন বলি—বুলাকিরা খুবই বড়লোক, আমার তরফ থেকে এ অসীম সাহস, ওর তরফ থেকে এ আন্তরিক শপথ, দুইই অসম্ভব।

পদ্ম নাট

শেষ পর্যন্ত মত দু'জনেরই হয়।

সন্ধ্যায় বুলাকিদের বাড়ি বাই। সাগ্রহে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যায় ড্রাইংরুমে বসাতে। কী স্থান্য ক'রেই না সাজানো সেই ঘরখানা। দরজায়-জানালায় ঝুলছে সব হালকা কাপড়ের দামি দামি পরদা। সাধারণ বাঙালী ঘরের পরদার মতো আবর্জনার আবরণ তারা নয়, তাদের কাজ শুধু স্থান্যকে অতি স্থান্য করা। বুলাকি বলে—বস্থান এখানে। চা খেয়ে তারপর পড়ার ঘরে যাবেন।

সমস্ত যেকোটা চক্চক্ করছে আয়নার মতো, চলতে গিয়ে পা পিছলে যায়। বুলাকি চট ক'রে একটা হাত ধ'রে ফেলে, অগ্নি হাতের ধাক্কা লেগে সেন্টার-টেবিল থেকে পেতলের ফুলদানীটা সশব্দে প'ড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে। বড়ই অপদস্থ হয়ে পড়ি। লজ্জিত হয়ে হাত বাড়িয়ে তুলতে বাই। বুলাকি বলে ওঠে—বাঃ রে, আপনি কেন তুলবেন, আমি তুলছি, আপনি বস্থান।

একটা কোঁচের উপর ব'সে পড়ি। বুলাকি আমার দিকে চেয়ে ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে তুলতে চেষ্টা করে। বলে—মাও সেদিন এমনি প'ড়ে গিয়েছিলো। বাবা বলেন, কার্পেট পেতে দেবো। আমার কিন্তু কার্পেট মোটেই পছন্দ হয় না। এক-একটা বেন গুলোথেকো রাক্স।

মুখে হাসি টেনে বলি—না বুলাকি এ ঘরে আর আমি আসবো না। কখন প'ড়ে গিয়ে হাত পা-ই না ভেঙ্গে ফেলি।

বলে—না মাস্টারমশাই একটু চলতে-চলতেই অভ্যাস হয়ে যায়।

উত্তর করি—চলতে গিয়ে চলাটাই অভ্যাস হবে কি পড়াটা

পদ্ম নাভ

অভ্যাস হবে কে জানে। হঠাৎ-বলা সত্যের মতো কথাটা নিজের কানেই বাজে, মনটা কেমন খেন খচ ক'রে ওঠে।

বুলাকি তার মা বোন সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। একদিনের পরিচয়ে নিঃসঙ্কোচে সবাই আমার কাছে আসা-বাওয়া করে। মেয়েদের অভিভাবকরা আমাকে দেখে ভয় পায় না, মেয়েরা লজ্জা পায় না—অন্তরপুরুষ অপমান মানে। প্রতি সন্ধ্যায় পড়াতে বাই নির্বিকার শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জন ক'রে বাড়ি ফিরে আসি।

পড়বার সময় বুলাকির ছোট বোন ছায়া এসে পাশে দাঁড়ায়। বছর দশেক বয়েস, রংটা একটু ময়লা, মনে হয় ছায়া খেন বুলাকিরই ছায়া। গলার স্বর দু'জনেরই যেমনি সুর তেমনি মিষ্টি। বুলাকিকে অল্প কষতে দিয়ে ছায়ার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই। কত আদর করি। হঠাৎ মনে হয় ওকে উপহাস করছি; নিজের কাছেই খেন নিজে বরা পড়ে বাই। ছেড়ে দিয়ে বলি—বাওতো ছায়া, চট্ট ক'রে এক গেলাস খাবার জল নিয়ে এস তো।

অরুণ এসে বলে—নরনার মাষ্টার মশাই। কি বুলা পড়া হ'লো?

বুলাকি হাতটাকে হওয়ার উপর ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—অরুণমাকে এখান থেকে বেতে বলুন মাষ্টারমশাই, তারি দুই ও, আমার অল্প সব তুল করিয়ে দেয়।

অরুণ বেরিয়ে বাবার মুখে উত্তরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়। নিম্নে আসি ওদের চোখের ভাষা প'ড়ে কেলি—বুকটা কেমন ক'রে ওঠে।

বলে উঠি—কই, অল্পটা হলো না এখনো?

বুলাকি চট্ট করে চোখ নাড়িয়ে নিয়ে কি খেন বলে। প্রথমটা কানেই পৌছয় না।

পদ্ম নাভ

জিজ্ঞেস করি—কি বললে ?—

বাড়ি ফিরে এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ি। ভাকি—সুরো।

সুরমা এসে জিজ্ঞেস করে—আমাকে খুঁজছিলেন ?

মনটা সমস্ত বুকময় ছুটোছুটি ক'রে কেবলই বলতে থাকে—হ্যাঁ সুরো, তোমাকেই খুঁজছি।

সুরমা শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করে—কথার জবাব দাও না কেন গো, এমন চুপ ক'রে রইলে কেন ?

উত্তর করি—না, এই বলছিলাম কি মাথাটা বড্ড ধরেছে। সুরমা বলে—ভাতটা নাবিয়ে এক্ষুনি আসছি।

পড়ার ঘরে এসে বসি। বুলাকির আসতে একটু দেরি হয়। শেল্ফ থেকে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকি। হঠাৎ একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে, লেখাটা অরুণের। একবার একটু দিখা আসে, পরক্ষণেই পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখি।

বাড়ি ফেরার মুখে কর্তার আপিস কামরায় ঢুকি। চিঠিখানা বুলাকির বাবার হাতে দিই। পড়া শেষ হয়। মুখের চুকটটা নাবিয়ে রাখতে রাখতে বলেন—স্টুপিড কোষাকার। কদিন বলেছি ওর মাকে ছোকরাকে নিষেধ ক'রে দিতে এখানে আসতে—ওসব পার্টনেসএর মানে আমরা বুঝি।

তিনি কি বোঝেন বুঝতে আমার বাকি থাকে না। তার অর্থ অরুণের অর্থাত্য। না হয় আর সব মিলিয়ে সে বা—বোধহয় উৎসাহই পেতো।

পদ্ম নাভ

বুলাকির বাবা ব'লে চলেন—অনেক, অনেক ধনুবার আপনাকে। আজকালকার ছোকরাদের মতো আপনি এসব পছন্দ করেন না ব'লেই তো সময় মতো জানতে পেলাম। আপনার মত শিক্ককই তো—এই রকম আরও কত কি। বিদ্যায় নেবার সময় অহরোধ করি নামটা আমার গোপন রাখতে।

অরুণকে আর এ বাড়িতে দেখতে পাইনে। শুনি তার নাকি এখানে আসা বারণ হয়ে গেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে।

অরুণ আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। কেবলই অহরোধ করে শুধু মাত্র একটি বারের জন্তে ওদের সাক্ষাতের সুবিধে ক'রে দিতে বলে—আপনাকে বলতে সাহস পেতাম না, কিন্তু জানি আপনি আমাদের দুজনকেই অত্যন্ত স্নেহ করেন, সেই ভরসাতেই—

কথা তার অসমাপ্তি থেকে যায়, সবটুকু অহুন্নর ফুটে ওঠে চোখে আর মুখে। বাছাই করা সব ভালো ভালো কথা ব'লে তাকে উপদেশ দিই। তবু অহরোধ করে। শেষ পর্যন্ত আশা দিয়ে বলি—আচ্ছা দেখবো চেষ্টা ক'রে।

অরুণ আবার আসে। আগ্রহের সঙ্গে উত্তরের অপেক্ষা করে। তাকে বলি—বুলাকি রাজি হবে না বোধ হয়। তাব দেখে মনে হয় ওর মন বদলে গেছে তাই সাহস পাইনি জিজ্ঞেস করতে।

ঠিক বিশ্বাস করতে চায়না, তবু কথাটা বিবন আঘাত করে অরুণকে। মুখ চোখ দিয়ে বেদনা বেন ফেটে পড়তে চায়। কিছু না ব'লে ধীরে ধীরে ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বুলাকি স্থলে যায় না। শুনি তার বিয়ের কথা চলেছে। পড়াতে বলি, বুলাকির মা গলা খাটো ক'রে বলেন—তিন দিন ব'রে কিছু

পদ্ম নাভ

খাচ্ছে না, আপনার কথা ও খুব শোনে, একটু বসি বুঝিয়ে বলেন—

বুলাকি টেবিলের উপর খুঁকে থাকে একটা বইকে উপলক্ষ্য করে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ব'লতে কোনো কথাই খুঁজে পাইনে, আন্তে একটা হাত রাখি তার মাথার উপর। মুখ তুলে একবার তাকায়। মুখখানা বড়ই শুকনো, ছুঁঁমির ভাবটুকু আর খুঁজে পাইনে, সেখানে দেখতে পাই একটা দৃঢ়তা। হু'একটা কথা বলতে যাই, গলা ধ'রে আসে। হঠাৎ মাথাটাকে হু' হাতের মধ্যে গুঁজে বুলাকি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তার দুঃখ ও দৃঢ়তা চোখের জলে গ'লে পড়ে।

কিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করি—ওর সাথে একবার দেখা করবে বুলাকি ?

মাথা নেড়ে জানান, না। একটু পরে তেমনি মুখ গুঁজেই প্রস্থ করে—ও নাকি কোথায় চ'লে যাচ্ছে ?

—তাই-তো শুনেছি, কিন্তু কোথায় যাবে বলতে পারিনে। মাথা না তুলেই বুলাকি ব'লে চলে—ওকে আমার হয়ে বলবেন, বাড়ির সবাই বা চেষ্টা করছে তা হবে না, আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি—পরে সব জানানো।

—যা বলবার আছে একটা চিঠিতে লিখে দাও।

চিঠিটা পকেটে পুরে দাঁড়াই। বুলাকি একবার আমার দিকে তাকায়, কৃতজ্ঞতা যেন রূপ ধ'রে হুটে উঠতে চায় সেখানে।

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার একবার গিয়ে চুকি কর্তার আপিস কামরায়। কর্তা বলতে থাকেন—বুলাকির বিষয়ে তো একরকম

পদ্ম নাভ

ঠিক, বেশ একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে। তা আপনাকে আমি ছাড়ছি
নে। ছায়ার জন্তেও আপনাকেই থাকতে হবে।

পকেটে হাত দিয়ে চিঠিটাকে চেপে ধরি। দূরত্বের সঙ্গে জানাই,
বাড়িতে একটু কাজ পড়েছে, চুশানি করার মতো সময় করা সম্ভব
হবে না।

বুলাকির বাবা একটু দুঃখিত হন। কয়েক মাসের মাইনে
জমিয়েছিলাম, টাকাটা হিসেব ক'রে দিয়ে দেন, পকেটে ফেলে বেরিয়ে
পড়ি।

বরাবর অল্পগদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হই। সমস্ত মনটা বিষেবে
ভ'রে ওঠে। সব ঘিষা বেড়ে ফেলে চিঠিখানা দিয়ে দিই অল্পগের
হাতে। সে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরে, বেন বলতে চায়—
এমন লোক ক'জন হয়—এত সহানুভূতি ক'জনের তিতর থাকে!

হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে জরুরী কাজ আছে ব'লে বেরিয়ে আসি।
একটা আংটি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরি।

স্বরমাকে ডেকে বলি—আসছে বুধবার আমাদের বিয়ের ছু'বৎসর
পূর্ণ হবে, সেদিন পরবে তুমি এটা।

স্বরমা আংটিটা হাতে নিয়ে পায়ের ধুলো নেয়। জিজ্ঞেস করে—
আমি তোমাকে কি দেব?

হেসে জবাব দিই—যা দিচ্ছ—

পরের দিন বাকী টাকা কটা নিয়ে স্থলে গিয়ে প্রথমেই চুকি
হেডমিস্ট্রেস-এর ঘরে। টাকা ক'টা টেবিলের উপর রেখে অস্থরোণ
করি—এবার প্রাইভেটের সময় অভিনয়-প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারে
বেন সেটা ব্যয় করা হয়।

ভারিষ্কি

হিসাব করিয়া দেখা গেল কন্মের পক্ষে ছয় শত টাকা প্রয়োজন।
কর্দ হইতে চোখ তুলিয়া সঙ্গ্রহ দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকইলাম
—টাকাটা আসে কোথা হইতে? জানি, স্বধেন উত্তর আশা করে
আমার কাছে; চোখের ভাব পরিবর্তন করিয়া সমস্তা মীমাংসার পথ
চিন্তা করিতে লাগিলাম।

নিজের পরিবার লইয়াই বেচারা যথেষ্ট বিব্রত ছিল, অধুনা
বাপ-মা-মরা বিবাহযোগ্যা ভগিনীটিকে নিয়া বেন অথই অবস্থায়
পড়িয়াছে। কালোর দেশে কালো বর্ণ অচল, রেণুর ভবিষ্যৎ তার
বর্ণের মতোই অন্ধকার এ-কথা মানিয়া লইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবার
মতো মৈরাত্ত বধন স্বধেনের মনকে পাইয়া বসিয়াছে, এমন সময়
সামান্ত একটু ভরসা পাইয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে পরামর্শ ও
সাহায্যের জন্ত। আশারূপ একটি পাত্র নাকি রেণুকে দেখিয়া পছন্দ
করিয়াছে; দাবির মধ্যে বিরোধরূচ বাবদ সামান্ত কিছু অর্থ ও স্বল্প
করখানা অলঙ্কার। পাত্রের তুলনায় দাবি সামান্ত হইলেও স্বধেনের
ক্ষমতার তুলনায় পর্বত প্রমাণ। বহু হিসাবে স্বধেনের প্রতি
মমতাবোধ ও সহানুভূতি আমাদের আছে তাকে বাস্তব রূপ দিবার
মতো ক্ষমতা অনেকেরই নাই, আমার যেটুকু বা আছে তাও খুবই
স্বল্প। সাহায্য বা দার বেতাবেই হোক উপস্থিত টাকাটা সংগ্রহ করা
বার কোথা হইতে? বন্ধুদের মধ্যে একটি মাত্র লোক যে ইহার

প ল ল না ত

দশগুণ টাকা স্বচ্ছন্দে নান পৰ্বস্ত করিয়া দিতে পারে, সে অবিনাশ। কিন্তু এমন একটা কাঠখোঁটা লোকের কাছে বাইতে হইবে ভাবিতেও মন আমার সঙ্কচিত হইয়া উঠে।

পরিচিতের মধ্যে কিছুটা দাবি চলে এমন ধনীব্যক্তি আর একটিও খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা স্বধেনকে সঙ্গে লইয়া অবিনাশের দোকানের উদ্দেশ্যেই রওনা হইয়া পড়িলাম।

ব্যবসায় অবিনাশ উন্নতি করিয়াছে মানিতেই হইবে। স্বল্প মূলধন লইয়া পাঁচ বৎসরের ভিতর তিনতিনখানা বড় দোকান করিয়া ঝাঁকিয়া বসিয়াছে—কাপড়, কাটা-কাপড় ও মনিহারি। মনিহারি দোকানে বসে সে নিজে, দু-জনে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম।

এক মুখ চাপদাড়ি লইয়া কাউন্টারের পিছনে গম্ভীরমুখে অবিনাশ বসিয়া আছে, দুই দাঁতের চাপে একটা মোটা চুকট। দোকানে চুকিতেই ক্রমে বাঁধান অমরোষ নজরে পড়ে ‘বার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না’। কোনো কারণে যে অবিনাশ লজ্জা পাইতে পারে লিখিয়া না রাখিলে অবিশ্বাস তার মুখ দেখিয়া ধারণা করা অসম্ভব। অমরোষ লজ্জনকারীরা কিন্তু বলে লিখিত কথাটাও মিথ্যা।

আমাদের দেখিয়া তারি গলায় প্রশ্ন করিল, ‘কি হে, কি খবর?’ চুকট মুখে থাকায় কথাগুলি জড়ান।

বলিলাম, ‘এসেছি তোমার কাছে, একটা জরুরী পরামর্শের জন্যে।’

‘আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, হাতের কাজটা সেয়ে নিচ্ছি। আগিস কামরায় অপেক্ষা করো।’

আমাদের অভিপ্রায় জানা নাই, তবু কথা বলার পদ্ধতিতে মনে হইবে আমরা যেন চাকরির উদ্দেশ্যে। আগিস ঘরে ঢুকিবার সময়

বলিলাম, ‘দশ মিনিট আগে কাজটা শেষ হলে দশ মিনিট আগেই এস, পাড় চুয়াল হয়ো না।’

ঘটনাটা আজও আমি সকৌতুকে স্মরণ করি : আমার বাড়ি একদিন ওর ছ’টায় আসিবার কথা ছিল, হঠাৎ বাহিরে আসিয়া দেখি বাড়ির ঝানিকটা দূরে অবিনাশ পায়চারি করিতেছে—ছ’টা বাজিবার তখনও নাকি সাত মিনিট বাকি ছিল।

ভাগ্য ভাল অনেকটা আগেই আজ অবিনাশ আসিল। স্বধেনের হইয়া আমিই শুরু করিলাম। যনোযোগ দিয়া দেখিবার সময় অবিনাশ কান বন্ধ করে না বটে, যনোযোগপূর্বক শুনিতে বা বলিতে হইলে চোখ বন্ধ করিয়া লয়। স্বধেনের পারিবারিক অবস্থার কথা নতুন করিয়া বলিবার কিছু নাই, তাই বিশেষ করিয়া অনাথা অনুচ্চা ভগিনীটিকে লইয়া উপস্থিত সে কি প্রকার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে সে-বিষয়ে সংকীর্ণিত আভাস দিয়া বলিলাম, ‘সম্প্রতি একটি ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, বিয়েখরচ বাবদ নগদ দেউশ’ টাকা আর সামান্য ঝানকর গয়নার দাবি আছে—’

চোখ বুজাই আছে : অবিনাশ বলিল ‘অনাথাকে বিয়ে করতে এসে যে দাবি জানায় তার হাতে মেয়ে দেওয়াইতো উচিত নয়। তা ছাড়া স্বধেন টাকা পাবে কোথায়?’

ভাল, অবিনাশও প্রশ্ন করে।

বলিলাম, ‘সে ভুলেইতো তোমার কাছে এসেছি।’

অবিনাশ চোখ খুলিল। বলিল, ‘আমি তার কি করিতে পারি বলো, আমার হাতখরচ তো মোটে একশ’টাকা।’

‘ও তো একটা কথার কথা, সব কিছুই মালিক তো তুমি-ই।’

গভীর চালে ডাইনে-বায়ে মাথা নাড়ে অবিনাশ। ‘সে হয় না। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঁধা আইনের বাইরে আমি বাই নে।’

আইন অবিনাশ নিজেই বাঁধিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে বাঁধন চিলা করিতেও সে পারে। অংশীদার দূরের কথা, তার মতের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ তুলিবার মত কোনো অভিভাবকও নাই। দারিদ্রকে স্পষ্ট ও নয়ভাবে চিনিবার দুযোগ বার জীবনে ঘটিয়াছে তার মধ্যে অভাবের প্রতি সহানুভূতির অভাব দেখিলে শুধু দুঃখ হয় না রাগ হয়। মনে মনে রীতিমতো অসন্তুষ্ট হইলাম : স্বধনের স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া চাপিয়া গিয়া বলিলাম, ‘তা-ই না হয় হলো, স্বধে টাকা খাটানও তো তোমার একটা ব্যবসা, টাকারটা না হয় বারই দাও।’

মুদ্র হাসিয়া জবাব দিল, ‘ইনভেস্টমেন্ট কোথায় করতে হবে তারও বাঁধাধরা নিরস্ত আছে—বিজনেস্ ইজ বিজনেস্।’

স্বধেন এ যাবৎ চূপ করিয়া ছিল। আশার কোনো আভাস না পাইয়া চোখ তার ছলছল করিয়া উঠিল। শেষ চেষ্টা হিসাবেই বোধ করি বলিয়া ফেলিল, ‘আমি তাই কোনো কিছু জানতেও চাইনে বুকতেও চাইনে ; রেগুকে তোমার কাছে এনে সব তার তোমার হাতে তুলে দেবো, দেখি কেমন কিছু না ক’রে থাকতে পারো।’

‘না, কোনো তার নেবার মধ্যে আমি নেই, এর-ওর তার নিয়ে নিয়ে হয়রান হ’য়ে উঠেছি।’

তিক্তভাবে কথা কয়টা বলিয়া অবিনাশ চূপ করিল। ঠেহার পর কোনো অমরোদের কথা উচ্চারণ করিতেও মুখে বাধে। কিছুকণ তিন জনেই চূপচাপ। অবিনাশ চেনার ছাড়িয়া হাত পাঁচেক আয়গার মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিল। হঠাৎ বামিয়া মুখের চুকটটাকে

ঠোঁটের সাহায্যে কোণস্থ করিয়া শক্তভাবে দাঁতে চাপিয়া ধরিল।
'রেশপনসিবিলাটি একটা না একটা বাডের ওপর এসে পড়বেই।'
আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'এই দেখ না, অবন, বাবুর মেয়ের বিয়েতে
অত সব ঝাম্‌ল বড়োর সামনে পনেরো হাজার টাকা খরচের ভার শ্রেফ
ছেড়ে দিলে কি না আমার মত এক ইয়ংম্যানের হাতে—ক'দিন কি
খাটুনিটাই না গেছে।'

নালিশ ও ত্যক্ততার মধ্যে কেমন একটা গর্বের ভাব মিশানো ছিল।

বলিলাম, 'কবিতাকর্মা লোকের হাতেই লোকে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়,
আমরাও দেখ না সব ছেড়ে তোমার কাছেই ছুটে এসেছি।'

'তুমি ছাড়া আর আছেই বা কে, কার কাছে যাব বলো।'
স্বপ্নের কণ্ঠ করণ।

অবিনাশ চেয়ার টানিয়া বলিল। 'কিন্তু এ-ভার আমি কি ক'রে
নিই, ভার আর ভার, আমি ছাড়া আর যেন লোক নেই—' কিছুক্ষণ
দম ধরিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিল 'নিজের জমা টাকা থেকে
টেনেমেনে বডজোর একশ' টাকা সাহায্য আমি করতে পারি, কিন্তু
বাকিটা—'

বলিয়া পুনরায় অবিনাশ চোখ বুজিল। এবার প্রশ্নটা নিজে
করিয়াছে বলিয়াই মনে হইল, তাই উত্তরের অপেক্ষায় আমি ও
স্বপ্নেন চুপ করিয়া রহিলাম।

অবিনাশ চিন্তা করিয়া চোখ মেলিল। আপন মনেই বলিতে
লাগিল, 'যত সব ইয়ে—নিজের কাজের অন্ত নেই তার ওপর—'
আমার চোখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'টাকাটা ধার আমি দিতে পারি
যদি তুমি লিকিওরিট ঝাড়াও, ইন্টারেস্ট মিনিমম টুয়েনটিকোর পার্সেন্ট

—বিজনেস্ ইজ বিজনেস্। যদিও গোল্ড লিকিওরিটি হাড়া ইনভেস্ট আমরা করিনে।’

অবিনাশ ধামিল। এমনভেও অস্বীকার আমি করিতাম না, বিশেষ করিয়া অন্তকে অহুরোধ করিতে আগিয়া নিজে পিছাইলে চলিবে কেন।

বলিলাম, ‘বেশ তাই হবে। তবে এটা না ব’লে পারলাম না যে, তুমি পাকা একটি ছোটলোক হয়েছ।’

কথা শুনিয়া অবিনাশ বিজ্ঞের মতো শুধু একটু হাসিল।

আমরা সাগ্রহে আগাইয়া দিলাম, অবিনাশ ছু-চারবার আপত্তি জানাইয়া সামান্য কাজের সবটুকু ভার গছিয়া লইল। পাত্তপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হইতে শুরু করিয়া পুঙ্ক্ত ঠিক করা, মায় বিয়ের জিনিষপত্র কেনাকাটির ব্যবস্থা করিয়া মঙ্গলমতো বিয়েটি করাইয়া দিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অবিনাশ গ্রহণ করিল। অবশ্য টাকার অঙ্কটা ছ’শর উর্ধ্বে নয় একথা বার বার পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লইতে ভুল সে করিল না।

আমি ও স্বধেন দুজনে মিলিয়া পাঁচশ’ টাকার এক হাওনোট লিখিয়া দিলাম। অবিনাশ লম্বা চেক বইখানা ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া সজ্জে টেবিলের উপর রাখিল। মলাট পাল্টাইয়া প্রথম পাতাটাকে টান করিবার ছলে বার তিন সময়ে হাত ব্লাইয়া লইল। ছেলেপুলেদের মধ্যে অনেকে আছে ষাণ্ডবস্ত্র না খাইয়া হাতে করিয়া রাখিতে ভালবাসে : তাদের চোখের দৃষ্টি ও হাতের যত্ন লইয়া অবিনাশ চেকবইখানি নাড়াচাড়া করে।

লেখা হইয়া গেলে বলিলাম, ‘তোমার ঐ একশো টাকাও এই সঙ্গে লিখে দিলেই তো পারতে।’

প দ্ব না ভ

বাড়ির ফাঁকে দেখা দিল সেই ক্রীণ হাসি। বলিল, 'সেল অব বিজনেস তোমার একেবারে নেই। নিজের টাকা এখানে কোথায়; এ টাকায় ওভাবে হাত দেওয়া মানে তো তকিল তসক্ক।'

এদের বিচারবুদ্ধিই আলাদা। প্রতিপদে এরা নিয়মকানুনের চাকর। নিজের টাকা নিজে দিবে তার আবার এখান আর ওখান কি। যদিই বা হয়, সময় মত পূরণ করিয়া রাখিলেই হইল।

স্বপ্নেন বলিল, 'ও টাকা আর আমাদের দেবে কি বরং এটাও তোমার কাছেই রেখে বাই, ঋণচপত্তর তো সব তোমার হাত দিয়েই হবে।'

কথাটা মিথ্যা নয়। চেকটা অবিনাশের নিকট রাখিয়া ছুজনে চলিয়া আসিলাম।

বিয়ের দিন দুই আগে অবিনাশের গাড়ি আসিয়া পাড়াইল আমার দরজায়। ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ার টানিয়া অবিনাশ বলিল। চুকটটা নধ্যা ও বৃদ্ধাভুটে টিপিয়া মুখ হইতে নামাইল, মুখ গভীরতর করিয়া বলিল, 'দরজাটা ভেজিয়ে দাও।'

আমার এক গায়ক বন্ধু আছে, গান গাইবার সময় তার স্মিত মুখ ধমধমে হইলেই বুঝিতে পারি এখন সে গিটকিরি ছাড়িবে : অবিনাশের মুখের গাভীর্ষ ও বধন উৎকট হইয়া ওঠে, বেশ বুঝি হয় সে কাজের কথা বলিবে, নয় তো উপদেশ দিবে। জানা থাকে সঙ্কেত আজ মনটা শঙ্কিত হইল। কথামত দরজা ভেজাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ব্যাপার কি বলো দেখি?'

'কাজকর্ম, জিনিসপত্তর, টাকা পয়সা, কোনটার কি কর্দ করেছি তোমাকে দেখাতে এলাম।' বলিয়া কতক কাগজ বাহির করিয়া সে টেবিলের উপর রাখিল।

গল্প না শু

বাঁচা গেল, কোন দুঃসংবাদ নয়। বিয়ের কর্দ দেখাইতে দরজা দিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তা অবিনাশের শ্রেণীর লোক ছাড়া বোধগম্য হওয়া কঠিন। কাজে, কথায় ও চালচলনে পাণ্ডীর্থের ক্রটি না ঘটে এটাই যেন জীবনে প্রধান লক্ষ্য। কর্দগুলি দেখিয়া কিছু একথা অস্বীকার করিবার জো থাকে না যে শূন্য রাবিয়া কাজ করিবার পদ্ধতি লোকটির সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। এ জাতীয় লোকের হাতে কাজের ভার দিবার পর অক্ষমতার ভয় থাকিতে পারে, অবহেলার ভাবনা থাকে না।

বিয়ের দিন দোকানের কতক কর্মচারী লইয়া অবিনাশ বিয়েবাড়ি রীতিমতো জাঁকাইয়া বসিল। হৈ-চৈ হাঁক-ডাক কোনো কিছুই অভাব রহিল না। অবিনাশ দাঁতে চুপুট চাপিয়া এখানে তদবির করিয়া বেড়াইতে লাগিল—এক কথায় আয়োজন সামান্য হইলেও সর্বাঙ্গীন।

আমার উপর ভার ছিল বরষাজীদের আদরআপ্যায়ন করিবার, আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। লগ্ন যতই সন্নিকট হইল বরকর্তাদের মধ্যে চঞ্চলতাও বাড়িতে লাগিল দেখিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইলাম। একটু খোজ নিতেই জানা গেল, মুখ ভার করিয়া অত কিসকাস কথা-বার্তার মূলে, তারা আরও কিঞ্চিৎ নগদ অর্থ চায়। এ বিয়ের পিছনে মস্ত একজন ধনীলোক আছে একথা আগে জানিলে এত অল্পে কালো মেয়ে ঘরে তুলিতে কিছুতেই নাকি রাজি হইত না।

বরকর্তার সঙ্গে পাকাকথা অবিনাশই বলিয়াছে, তাকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিলাম। কিসের দ্বায় দিবার জন্য মনিব্যাগে হাত চুকাইয়াছিল, ধীরে ধীরে খালি হাতটা টানিয়া বাহির করিল। শাটের

পঞ্চম অধ্যায়

একপাশ তুলিয়া পেটকোলা মনিব্যাগটা চুকাইয়া দিল কতুয়ার পকেটে, তারপর কোনো কথা না বলিয়া চলিতে শুরু করিল।

অবিনাশ গিয়া কিন্তু আপসের পথে একেবারে এক পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া বলিল। কোনো বাকবিতণ্ডার প্রস্তাব না দিয়া বরকর্তাকে বলিল, ‘গরিবকে বিপদে ফেলে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করতে চান আপনি—আপনি ছোটলোক, এ মুহুর্তে আমার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান।’

ইহার পর গেল বিতর্কিত রকমের একটা কাণ্ড বাধিয়া। কথা শুনিয়া বরপক্ষের দু-চার জন কথিয়া উঠিল। কর্তার উপর হুমকি দিতে দেখিয়া, অবিনাশের কর্মচারিবৃন্দ ঘে-মুতি ধারণ করিল তার সামনে বীরত্ব প্রকাশটা স্বকলপ্রসূ হইবে না বুদ্ধিতে পারিয়া বরপক্ষীয়রা বরসহ সরিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিল। নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ কর্তে অনেক কথা বলাবলি করিতে করিতে তারা বাহির হইয়া গেল। কথাবার্তা হইতে বুঝা গেল ইহার একটা প্রতিশোধ না লইয়া তারা ক্ষান্ত হইবে না।

এক ছোকরা ঘাইবার মুখে অবিনাশকে সাবধান হইয়া চলিবার উপদেশ দিয়া গেল। আনান না দিয়া কিছু করাটা বীরত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া, না, ভবিষ্যতে নিজের অক্ষমতার দায়টা অবিনাশের সাবধানতার মাড়ে চাপাইবার সুবিধার জন্য ঠিক বুঝা গেল না।

এ সকল অবস্থার বাড়ির মেয়েরা যা করিয়া থাকে তা-ই করিতে লাগিল।

‘এ কি সর্বনাশ করলে অবিনাশ—’, কান্না চাপিবার চেষ্টায়ই বোধ হয় স্থবন ধামিল।

পঞ্চম অধ্যায়

অবিনাশের অর্বাচীনদের মতো এই রুচ ব্যবহার দেখিয়া কিছু বলিব মনে করিয়াছি এমন সময় স্বধেনকে সে বলিল, ‘ভার যখন আমার ওপর ভাবনাও আমার, এখন কোনো কথা বলতে এস না।’

ধসধস করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া অবিনাশ তার ড্রাইভারের হাতে কোথায় যেন পাঠাইল। কি উদ্দেশ্যে চিঠির, কাহার নিকট পাঠাইল, কিছুই বুঝা গেল না। অবিনাশের মুখের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবার মতো ভরসাও পাইলাম না, ধমধমে আবহাওয়ার উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পত্রবাহকের সঙ্গে একটি যুবক আসিয়া হাজির। যুবকটিকে লইয়া কিছুটা তফাতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়া অবিনাশ আমাকে ডাকিল। বলিল, ‘এর নাম নরেন। আমাদের স্বজাতি, ভালো ঘর। আই-এ পর্বন্ত পড়েছে, আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট, আমার কথা ও ফেলবে না কিছুতেই।’ নরেনকে বলিল, ‘ত্রিশ টাকা পাচ্ছ, সামনের মাস থেকে পঞ্চাশ পাবে, আমি থাকতে সংসার চালাবার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।—একুশি বিয়ে করতে হবে—মেয়ের বাপ-মা নেই, রঙ কালো, বুকে।’

নরেন ঠিক বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। প্রথমটার কেমন খতমত খাইয়া গেল। একটু সামলাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, ‘বাবা নেই, মা’র একমাত্র সন্তান আমি, আমার বিয়ে তাঁর মন্ত নথের ব্যাপার—তা ছাড়া এমন একটা কারণ আছে—অবশি আপনাকে বলতে বাধে—’

নরেন ধামিল। মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত প্রকাশ করায়ও

পঞ্চম অধ্যায়

কঠিন বটে। আপত্তির বড় কারণ মেয়ের বর্ণ না। অন্য কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

তেমনি ছাড়া ছাড়া ভাবে নরেন বলিয়া চলিল, ‘আপনি আদেশ করলে ‘না’ বলা অসম্ভব আমার পক্ষে—আপনার ওপরই সব ভার ছেড়ে দিচ্ছি—’

আবার সেই তার ছাড়িয়া দেওয়া : অবিনাশের মুখ স্নান হইয়া আসে, আন্তে আন্তে বলে ‘আচ্ছা তুমি যাও।’

অবিনাশের চোখমুখ দেখিয়া মনে হইল সে যেন ভয় পাইয়াছে। তার বিবর্ণ চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া আমিও ভয় পাইলাম। আমরা কি স্থির করি জানিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত অবস্থায় অপেক্ষা করিয়া আছে। অবিনাশ চলিতে শুরু করিল : কি বলিব কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে শুরু করিলাম।

স্বপ্নের কাছে আসিয়া অবিনাশ দাঁড়াইল : মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ‘আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে কোনো আপত্তি আছে ?’

অকস্মাৎ এমন একটা কথা শুনিয়া সকলে অস্তিত্ব হইয়া যায়। স্বপ্নের শুধু বোকার মতো ইঁদুর করিয়া ডাকাইয়া থাকে অবিনাশের মুখের দিকে। এই দাড়িওয়ালা নীরস লোকটির হাতে মেয়ে দিবার জন্য অনেক আধুনিক মেয়ের বড়লোক বাপ বেঁচে বেলা হাঁটাইয়া করে এ কথা জানিতে কারুর বাকি নাই।

বাড়িময় একটা হলুদ পড়িয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, মেয়েটার ভাগ্য বটে।

কাজ শেষে বিয়ের পিড়ি হইতে নামিয়া অবিনাশ আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বেশ অসুস্থ করিলাম তার সর্বশরীর কাঁপিতেছে। আমার

প দ্ব না ভ

একটা হাত মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'সংকৃত মন্ত্রগুলোর অর্থ লক্ষ্য করেছ ?'

বিয়ের মন্তরে কে কবে অর্থ খুঁজিতে বসে, তা ছাড়া দেব ভাবার 'পরে দ্বন্দ্বলও খুবই কম, বলিলাম, 'না—কেন ?'

'উঃ কত বড়ো রেসপন্সিবিগিটি—'

জীবনের প্রতি কি উৎকট দৃষ্টিভঙ্গি। হস্ করিয়া হাস ফেলার শব্দ হইল। দীর্ঘশ্বাস নিশ্বসই—অল্প সময় হইলে বিশ্বাস করিতাম না, ভাবিতাম হাই তুলিয়াছে।

বিয়ের মন্তরে বড় বড় প্রতিজ্ঞা যখন অবিনাশের দান্নিষবোধে কাপুনি ধরাইয়া দিয়াছে, আমার মাথায় তখন অল্প চিন্তা। বিরোধিতা বাবদ দেয় নগদ টাকাটা বাচিয়া গেল—তুচ্ছ কথা নয়। যদিও আজকে অবিনাশ এখন বর, তবু জানি, হাওনোটের টাকাটা আমাদের পরিশোধ করিতে হইবে—বিজনেস ইজ বিজনেস।

মনিব্যাগ

বাংলার এক বিখ্যাত রঙ্গালয়ে বাংলার মেয়েদের সম্পর্কে বেশ উপদেশাত্মক একটি নাটক অভিনয় চলছে। অনিমেব তার বৌদি ও এক বান্ধবীকে নিয়ে গেলো সেই অভিনয় দেখতে। অনিমেব ষিরেটার বডো একটা দেখে না। সে সিনেমা দেখিয়ে ছেলে, জ্ঞান দুরবীণ ক'বে চলচ্চিত্রাকাশের প্রত্যেকটি তারক-তারকার হাব-ভাব ও গতি-বিধি নিখুঁতভাবে পাঠ ক'রে নিয়েছে। আধুনিক 'ড্রইংরুম টকে' তাই বিশেষ একটা স্থান আছে তার—বিশেষ ক'রে আর্টের আলোচনায় তো অখণ্ড অধিকার।

অনিমেব নিজে বলে মাঝখানে, একপাশে তার বৌদি, অপর পাশে ব্যাবিস্টার কন্ঠা ডলি। অভিনেতাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি কোথাও আর্টের চমক খেলে যায় সেটা জানা এবং জানানোর ভার অনিমেবের উপর। অভিনয় শুরু হবে—ঠিক এমনি সময় সামনের 'রো'তে যে তিনখানা সিট কোল পেতে অপেক্ষা করছিলো,—এসে জুড়ে বসলেন তিনটি তরুণী। মাঝায় ও কপালে তাদের নিবেদনের নিশানা নেই—অনিমেবের উৎসাহ বেড়ে গেলো। সঙ্গে যদিও একটি বান্ধবী রয়েছে, হলে কি হবে, বান্ধবীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলার আগ্রহ তার অসীম। এ বিষয়ে সে একেখরবাদী—একেখরবাদী ছাড়া তার নেই। অনিমেবের দুঃখ হয় এই ভেবে; মেয়ে তিনটি সামনে না ব'সে যে-কোনো পাশে এসে বসলে হুবিধা হতো চের বেশী। তার দু' পাশে

পদ্ম নাভ

ছুটি শূন্য রয়েছে, তারই একটির উপর দিয়ে সার্কানীয়ানের পটুতা ও সতর্কতা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে অনারাসে আলাপ জমিয়ে বসতে পারতো। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যকে বিকার দিয়ে অনিমেব অভিনয়ের দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে।

অভিনয়ের শুরু থেকে শুরু হয় সব মোটা রকমের দুঃখের কথা। দুঃখটাকে গাঢ়তর করার জন্য লেখক মাঝে-মাঝে এক-একজনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। নেয়েদের দৃষ্টি চোখের জলে কেবলই ঝাপসা হয়ে আসে। অনিমেবের বৌদি ভুলে তাঁর কনাল ফেলে এসেছেন—চেয়ে নেন অনিমেবের কাছ থেকে। অনিমেবের কাছে কিন্তু অভিনয়ের দুঃখের বহরটা মোটেই ভালো লাগে না—তা হলেও ছবিতাদের সে কিছু বলতেও পারে না! বিশেষ ভরক'রে বিরুদ্ধ মত বহাল রাখার সময় ক'রে নেওয়া সেখানে সম্ভব নয়।

বল্ল-পরিসর রাস্তা তাতে আবার নিজের 'রো'তে জোড়ায়-জোড়ায় সব নীরস হাঁটু—এদের বাঁচিয়ে ঘন-ঘন বাইরে যাবার তাগিদ অনিমেবের নেই। তৃতীয় অঙ্কের শেষে ড্রপ পড়বার পরে সিটে ব'সেই সে পানওলার কাছ থেকে একটা পান কিনে মুখে পুরে দিলো। হাত মুছবার জন্যে বৌদির কাছ থেকে কনালটা হাতে নিরেই কি যেন বলতে বাবে এমন সময় ডলি ব'লে উঠলো—উঃ, কি চমৎকারই না হচ্ছে। সত্যি মনটা ভারি ঝরাপ লাগছে ঝট্টটাকে রেখে এসেছি ব'লে। আচ্ছা, আপনার ভালো লাগছে না অনিমেবাবু?

অনিমেব মুখে কিছু না বলে, এইমাত্র বৌদির হাত থেকে নেওয়া সেই কনালটা বাড়িয়ে ধরলো ডলির কোলের কাছে। ডলি সেটা হাত দিয়ে একবার দেখে নিয়ে তার ছোট্ট কনালখানা অনিমেবের

পদ্ম নাট

হাতের কাছে ধরে বললো—আর দেখুন এটার অবস্থা। অনিমেব বললো—আমারটা নেহাৎই বড়ো, না হয় দুখটা আমারও কিছু কম হয় নি।

অনিমেব কথা বলে বটে কিন্তু মন ও চোখ থাকে তার সামনের দিকে। ঠিক তার সামনের সিটে যে-মেয়েটি বসেছে, মাঝে মাঝে সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। অনিমেবের সঙ্গে দু-একবার চোখাচোখিও হলো। অনিমেবের মনে হয় মেয়েটি যেন তার পরিচিত। অবশ্য এ মনে হওয়ার কোনো অর্থ নেই, এমনি ধারা মনে তার সব সময়ই হয়। বিশ্বের কোঠায় যে-কোনো মেয়ের মুখই তার বিশেষ পরিচিত বলে মনে হয়। সবাই যেন বড়ো আপনার, শুধু বহুদিনের অসাক্ষাৎ ও বহু রকম জুলুম মারখানে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মাত্র।

ভলি অন্ত কোনো মেয়ের মধ্যে চাকল্য দেখলে বড়ো অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুই লক্ষ্য করেনি এমন ভাব নিয়ে সে প্রোগ্রামের পাতা উল্টাতে লেগে যায়। বৌদি নারীজ্ঞানত পরিহাসছলে অনিমেবের গায়ে একটা চিমটি কাটতে অনিমেব এমন একটা মুখের ভাব করে, যেন এ রকম অত্যাচার তাকে কত সইতে হয় সে-ই জানে, কিন্তু কিছুটা অত্যাচার আশা (আশঙ্কা নয়) করার মতো যে তার চেহারা তাতে সন্দেহ নেই।

ড্রপ উঠতেই বাইরের বাতি নিভে যায়। আবছায়া অন্ধকারে সেখানে দৃষ্টি হয়ে পড়ে অকর্ষণ্য, অনিমেব অস্বস্তি বোধ করে। অভিনয় দেখার চাইতে নভেলী চংএ একটা অভিনয় করার অন্ত মন তার নিস্পিন্ করতে থাকে। সে যখন ভেবে পাচ্ছিলো না কি করে আর একটু এগোনো যায়, এমন সময় টের পায় টপ করে কি যেন একটা পড়লো

পদ্ম নাভ

তার পায়ের কাছে। হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রেই বুঝতে পারলো বস্তুটা তুচ্ছ করার মতো নয়। চট্ ক'রে পেটাকে হুড়িয়ে নিয়ে একটু পরেই সে বাইরে বেরিয়ে গেল। আলোর কাছে নিয়ে দেখলো বস্তুটা ধলের মতো মরক্কো চামড়ার তৈরী ছোট্ট একটি মনিব্যাগ, মুখ তার ফাস্নার দিয়ে আঁটা। মাঝখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—জোনাকী সেন, ৩২ বি হিন্দুস্থান রোড'। অনিমেষের মুখ নিমেষে উজ্জল হয়ে ওঠে—এ যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, সাগ্রহ আয়ত্ত্ব।

ফাস্নারের দাঁতকপাটি ছাড়িয়ে স-সম্বর্পণে মুখ খুলে দেখে, তেতরে রয়েছে পাঁচটি টাকা, আর জ্ঞান জগতের চিরশিশুদের ছোট্ট একটি শিশু কন্ডাল। রংটা তার গোলাপী, এক-কোনে লেখা 'শনিবার'। বারের নাম প'ড়ে অনিমেষের মনটা ঝট্ ক'রে ওঠে। অমনি আবার ভাবে, আজ শনিবার, সেটা থেকে শনিবারের সাজ সজ্জে আসবে তাতে আর ভাবনার কি আছে। অতিরিক্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মনকে কতটা কুসংস্কারাপন্ন ক'রে তোলে ভেবে তার হাসি পেলো।

যেয়েটির বর্ণ যদিও ও খুব উজ্জল নয়—মুখখানা তারি সুন্দর। অনিমেষের চোখে সব চাইতে ভালো লাগে ওর চোখ দুটি; চেহারার সৌন্দর্যের চেয়ে পরিচয়ের অভিনবত্বের উপরেই অনিমেষের মোহটা বেশি। তা ছাড়া প্রতিদান ব'লে একটা কথা তো রয়েছেই। এমন সহজ সুন্দর ভাবে বাড়ির রাস্তা ও পরিচয়ের রাস্তা দুটোই নির্দেশ ক'রে দেওয়াতে অনিমেষ মনে মনে যেয়েটির বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারে না। মুহূর্তে তার চিন্তাধারা ঘটনার অলি গলি বেয়ে বহুদূর এগিয়ে যায়—অপরিচিততার সঙ্গে যেন নিবিড়ভাবে তার পরিচয় হয়ে গেছে। প্রথম পরিচয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে আলাপ হয়।

পিছন দিকে তাকিয়ে অনিমেষকে দেখা যাত্রই বে খুব ভালো লেগেছিলো—এ পর্বন্ত মেয়েটি সলজ্জভাবে স্বীকার করে, কিন্তু থলেটা বে ইচ্ছে ক’রেই কেলেছিলো এ কথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। অনিমেষ রাগ করে। এ সত্য কথাটা বললে সে যদি একটু আনন্দ পায় তো তাতে এত কুপণতা কেন। মেয়েদের এই নিরর্থক লজ্জার কোনো মানে খুঁজে না পেয়ে মনে মনে সে ভারি চ’টে যায়।

কল্লনায় বাধা পড়ে। হঠাৎ তার মনে হয় এও তো হতে পারে—এটা অজান্তে প’ড়ে গেছে, হয়ত একটু পরেই খোঁজ পড়বে। আবার ভাবে, মঞ্চে যে আন্দাজ মডক লেগেছে, অনিচ্ছাকৃত হ’লে কমান্বয়ের তাগিদে অন্তত একবার খোঁজ পড়তো। পড়লেও আশ্রয় যে ক্ষেত্রত দেবে না সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে তার নিজের সিটে ফিরে গেল।

মহিলা তিনটির পাশে যে কয়টি খুবক বসেছে, চাপা হাসির সঙ্গে তাদের কিসকাস কথাবার্তা থেকে অনিমেষ ভেবে নিলো নিশ্চয়ই তারা তার প্রতি মেয়েটির চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক’রেই এসব করছে। সে একটু বে অস্বস্তি বোধ না করলো তা নয়, কিন্তু গৌরব বোধ করলো তার চেয়ে ঢের বেশি। শেখাঙ্ক শেষের দিকে গড়িয়ে গেল। অনিমেষের বাহ্যিক দৃষ্টি আর একবার বোধহয় পিছন ফিরে তাকে দেখে নিলো; কিন্তু তার হেঁচকিতে যে অমূল্য বস্তুটি রয়েছে তার তালাশ পড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

বাড়ির গাড়ি অপেক্ষা করছে, অভিনয় শেষে মহিলা তিনটি উঠে বসেন। অনিমেষ কোনো প্রকারে এরই মধ্যে বিদায়-দৃষ্টি-বিনিময়টা পেয়ে নিরে সঙ্গীদের নিয়ে নিজের ‘বেবি’তে চেপে রওনা হ’য়ে পড়ে।

আভিগত অভিনয়ের মূল্য হিসেবে ডলি পুরুষদের এসব দুর্বলতাকে

পঞ্চ না ভ

সন্মুখে ভ্যানিটি কেসে রেখে দেবার মতো ব'লেই মনে করে। কিন্তু বাববার নিজের অভিশেষে যা পড়ায় সে বেশ একটু কষ্ট হয়েছে। সেটা প্রকাশ ক'রে অনিমেষকে অধিক ভুট্ট হবার সুযোগ দিতে সে রাজি নয়, তাই স্বাভাবিক সহজ ভাব বজায় রেখে পাড়িতে ব'সে কথাবার্তা বলতে থাকে। তার বাড়ির দোর গোড়ায় এসে যখন পাড়ী থামলো, নেমে শুধু ছোট্ট একটি নমস্কার ও ধন্যবাদ জানিয়ে সে ভেতরে চ'লে গেল।

বাড়ি ফিরে অনিমেষ সটান গিয়ে নিজের কামরায় চুকে পড়লো। একটা আরাম কৈদারায় ব'সে প্রাপ্ত বস্তুটিকে সন্মুখে নাড়াচাড়া করতে করতে সে নাম ও ঠিকানাটা আরও বার করে পড়ে নিলো। তার কলনায় ঘটনাবলী মধুর হতে মধুরতর হয়ে ফুটে উঠতে লাগলো।

বাতি নিভিয়ে দিতেই চাঁদ ঘেন বজ্জাতি ক'রে জানালা দিয়ে এক বলক জ্যোৎস্না অনিমেষের নাকে মুখে ছিটিয়ে দিলো। যুঝ তার এমনিতেও আসবে না—অনিমেষ ছাদে যাবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে পড়ে। কই মাহ ঘেমন মেঘের ডাকে এঁদো ডোবা ছেড়ে প্রাণের আবেগে নাচতে নাচতে ডাকায় উঠে আসে—অনিমেষও তেমনি শহরে চাঁদের হাতছানি পেয়ে ঘর ছেড়ে ছাদে গিয়ে আবেগের বেগে পায়চারি করতে শুরু করে। হঠাৎ তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি আসে। ঠিক ক'রে ফেলে কোনো একটা উপহার সে সঙ্গে রাখবে এবং সম্ভব হলে সুযোগ বুঝে মণিবাগটার মধ্যে পুরেই সেটা ব্যক্তিবিশেষের কাছে পৌঁছে দেবে।

কিন্তু কি দেওয়া যায় তাই নিয়ে পড়ে সে মহা ভাবনার। বস্তুটা বেশ অর্থপূর্ণ হবে এমন কিছু দেওয়া চাই। অনেক গবেষণার পর

প ল ল না ত

একটা পার্কার কলম দেওয়াই স্থির করে। অর্থটি হবে চমৎকার—
অথচ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে দেবে
'parker from a parker'। কবির আবহমান কাল থেকে জীবন-
তরী ঘাটে ভিড়িয়ে আসছেন, অনিমেঘ সেটাকে জীবন-গাড়ি রূপে
ঘাঁটিতে দাঁড় করিয়ে দেবে।—নিজের কল্পনা শক্তির উপর তার শ্রদ্ধা
বেড়ে যায়।

উপহার দেওয়া সে স্থির করে বটে, সঙ্গে সঙ্গে একটা দ্বিধা তার
মনে ঝঁকি দিতে থাকে। শুরুতেই অপর পক্ষ ব্যাপারটা এত স্পষ্টভাবে
যেনে নিতে চাইবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আসে। শেষ পর্যন্ত মনকে
প্রবোধ দেয় এই ব'লে, প্রথম পরিচয়ে নেহাৎ অসম্ভব হলে দু'দিন
না হয় অপেক্ষাই করবে।

অনিমেঘকে ছাদে টেনে নিয়ে চাঁদ আশ্বে আশ্বে পালিয়ে যায়।
বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেবার জন্তে অনিমেঘ তার ঘরে কিরে এসে
বিছানায় গুয়ে পড়ে।

চাঁদের ধারকরা আবছা আলো মনের ভিতর যে সব মায়ালোক
গ'ড়ে তুলেছিলো, দিনের নিষ্ঠুর আলো তার সকল ফাঁকি ধরিয়ে দিলো।
অনিমেঘের মনে প্রতিকূল অবস্থার চিত্রগুলি ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে
লাগলো। হয়তো মেয়েটির সঙ্গে দেখাই হবে না, হয়তো অনিচ্ছা
সত্ত্বেও ছেলেদের কান্নার হাতেই ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে হবে। এ সকল
ভাবনার ভিতর দিয়ে আশ্বে আশ্বে তার উপহার দেবার বাসনাটুকু
ধেন উবে যায়।

দিনের আলোটা বড়ো ঝটখটে ও কর্কশ, অনিমেঘ তাই সন্ধ্যার
বাওয়াই স্থির করে। সবস্তুটা দিন ছটকছুট করে সন্ধ্যার সেজেগুজে

ছোট্ট গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নির্দিষ্ট বাড়ির খোঁজে। কিছুক্ষণ পরে সত্যি সত্যি সে এসে হিন্দুস্থান রোডের ৩২ বি'র সামনে ঠাঁড়িয়ে পড়লো। ছোট রকমের একখানা একতলা বাড়ি। গত রাত্রে নারীদের সঙ্গে বাড়িটা যেন ঝাপ খেতে চায় না। অনিমেষের মনটা কেমন একটু দমে গেল। গত রাতে সঙ্গে তাদের বাড়ির গাড়ি ছিলো। কিন্তু এ বাড়িতে সে গাড়ির আস্তানা খুঁজে পেলো না। এ সকল অসামঞ্জস্যের জবাব পেতেও আবার ঘেরি হয় না, ভাবে, কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর গাড়ি হওয়া অসম্ভব নয়, আর খাড়ি ঘেঁষে বাড়ির অবস্থা আঁচ করাও আজকালকার দিনে মুকঠিন।

সামনের ঘরে তিন চারটি যুবক ব'লে গল্প করছে, দরজার গাড়ি ঠাঁড়াতে দেখে তারা উন্মুখ হয়ে তাকালো। অনিমেষ ভিতরে ঢুকে অতুষ্ক হয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো। একটি যুবক প্রশ্ন করলো—
কা'কে চান আপনি ?

সবারই মুখের ভাব যেন কেমন—অনিমেষ অস্বস্তি বোধ করে। এঁদের মাঝে ব'লে তেমন কোনো সুবিধা হবে বলেও তার ভরসা হয় না। ভাববার সময় নেই, তাড়াতাড়ি প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার, বললো—আজ্ঞে—কিছু যদি মনে না করেন—এ বাড়িতে জোনাকী সেন বলে কেউ থাকেন।

সেই যুবকই উত্তর করলো—হ্যাঁ, গত রাতে থিয়েটার দেখতে গিয়ে তার একটা মনিব্যাগ হারিয়ে গেছে। আপনি পেয়েছেন বুঝি ? লাল মরকো লেদারের, ভেতরে পাঁচটা টাকা আর একখানা গোলাপী রংয়ের ক্রমাল—এক কোনে লেখা 'শনিবার'—তাই না ? দেখি। ব'লেই হাত বাড়িয়ে দিলো।

পদ্ম নাভ

অনিমেধ শুধু একটা ‘হী’ ব’লে বস্ত্রচালিতের মতো ব্যাগটা পকেট থেকে বের ক’রে সুবকটির হাতে দিলো। সে বেশ দ্রুত পেগো সবাই ওরা মুখ টিপে হাসছে। সুবকটি বলতে লাগলো—অনেক ধন্যবাদ। সঙ্কট হলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় হ’লো। আপনার নাম ?

—অনিমেধ গুপ্ত।

—আমার নাম সময় বোস। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। সেক্ষত্ৰ শাপ চাইছি। দেখুন, মণিব্যাগ বস্ত্রটার ভেতরে থাকে টাকা পরলা, হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে—ওর উপর নিজের নাম লিখে রাখার কোনো মানেই হয় না। স্বজ্ঞাতিদের কাছ থেকে কিরে পাবার আশাও থাকে খুবই কম। কে এত হ্যান্ডাম পোয়াতে চাইবে বলুন ? অবিশ্তি আপনাদের মতো লোকের হাতে পড়লে ভাবনার কোনো কারণ থাকে না, এ না হয় বাড়ি বয়ে দিয়ে গেলেন, না হলে হয়তো খবর দিতেন গিয়ে নিয়ে আসতে। ভয় হয়েছে ছুট লোকদের নিয়ে, এক্ষেত্রে কিছু ওদের দিয়েই ভরসা—হয়ত দু’পাঁচ টাকা বেশিও ভ’রে দিতে পারে।

অনিমেধ বিমূঢ়ের মতো ব’লে কথাগুলো শুনে থাকে। কলমের কথাটা তার মনে পড়ে—কোভে লজ্জায় ক্ষিপ্তের মতো চেয়ার ছেড়ে সে উঠে পড়ে। সুবকটি গিছনে আসতে আসতে বলে—দয়া ক’রে চ’লে যাবেন না। আমার এ কিকির খাটবে না ব’লে থিয়েটার হলে ব’লে বজ্রা দশ টাকা বাজি রেখেছে। তাই তো অমন পাচ-পাঁচটা টাকা রিস্ক করেছিলাম। বাজির টাকাটা ধিয়ে যাবেন না ?

ততক্ষণ পাড়িতে ব’লে অনিমেধ স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। হর্নের ফোলা গালে চাপ পড়তেই সেটা চৌচিরে উঠে—‘বেবি’র কান্নায় দু’কান ডুবিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে যায়, আর কোনো কথাই তার কানে পৌছয় না।

বৈচিত্র্য

ভবানীপুরের একটা বড়ো রাস্তার ঘোড়ে দাঁড়িয়ে একটি হৃদয়-বুক প্রৌঢ় ছুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ছুঁতিন বছর অমুপস্থিতির পর কেন সে কলকাতায় ফিরে এসেছে সেটাই ছিলো আলাপের বিষয়-বস্তু। বুকেটি বলছিলেন, ‘ল পাশ ক’রে নেই যে কলকাতা ছাড়লুম, আর আসা হয়ে ওঠে নি। বছরখানেক বরষার মামার কাছে থেকে চেষ্টা করলাম কাঠের ব্যবসাটা বুঝে—কাঠ নিয়ে ব্যাপার, বড় শক্ত ঠেকলো। এবার এখানেই প্র্যাক্টিস করবো ব’লে—’

হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে বুকেটি গম্ভীরভাবে ছুঁহাত জোড় ক’রে বললো, ‘নমস্কার’। বলেই চুঁ ক’রে চলতে শুরু কোরলো। ভদ্রলোক দুটি প্রথমটা এই আকস্মিকতার অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তারপর একটু লক্ষ্য করতেই দেখতো পেলো ছুটি মেয়ের ঠিক পিছন পিছন সে এগিয়ে চলেছে। ভদ্রলোক দুটির মধ্যে একজন মুখটিপে হেসে বললো, ‘কলকাতার ব’সে এই প্র্যাক্টিসই কববে।’

বুকেটি এভাবে এগিয়ে চলেছে। উল্টোদিক থেকে সাহেবি পোশাক পরা একটা বুকে মুখে পাইপ স্মিলিয়ে হন্ হন্ ক’রে পাশ কাটাতে গিয়ে সেই বুকেটিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো, ‘আরে হুশান্ত যে! কবে—’

কথা শেষ করতে না দিয়ে হুশান্ত গম্ভীর মুখে—‘সবে যেয়েরা

পদ্ম নাভ

রয়েছেন, তোমার বাড়ি গিয়ে দেখা করবো।' বলেই চলতে শুরু করলো।

সাহেবি পোশাক-পরা বুঝকটির নাম অরুণ। অরুণ হুশাস্তকে চেনে আজ বহুদিন থেকে। তার অজুত রকমের চালচলন ও কথা-বার্তা ছাত্রাবস্থায় অরুণকে বড়ই আনন্দ দিতো, তাই এক সময়ে উভয়ের মধ্যে ছিল বিশেষ সঙ্গীতি।

হুশাস্তের স্বভাবগত অস্বাভাবিকত্বগুলো জানা থাকে সত্ত্বেও এতদিন পরে প্রথম সাক্ষাতে এ রকম ব্যবহার পেয়ে অরুণ কিছু-না-বুঝতে-পারা রকমের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো হুশাস্ত যে দিকে এগিয়ে চলেছে সেই দিকে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেভাবে থাকতে তাকে হলো না। একটু পরেই হো হো ক'রে সে হেসে উঠলো।

অনতিদূরে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটা ট্যান্ডিতে মেয়ে দু'টি চেপে বসলো, পাড়ি স্পীড নিয়ে বেরিয়ে গেল। হুশাস্ত দাঁড়িয়ে পড়লো ফুটপাথের মাঝখানে। হাসির শব্দে গিছন তাকিয়ে দেখলো অরুণ দাঁড়িয়ে ঘটনাকে বিশেষভাবে উপভোগ করছে। এগিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়াতেই সে তার হাত ব'রে একটা কাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ছালালো ওল্ড বয়, ওল্ড হাবিট আজও যায়নি দেখছি?'

'চেহারা ধোড়া ভালো; পরিচ্ছদে জীবিত বা মৃত কাকর মালিকানা স্বপ্নের ছাপ নেই উৎসাহ বেড়ে গেল।'

'বয়েস হয়েছে এখন এসব ছেড়ে দাও, কবে কে কোথায় অপমান করে দেবে।'

'কিছু ভয় নেই, বাংলাদেশে অন্তার করার লোকের যেমন অভাব, শাস্তি দেবার লোকেরও তেমনি অভাব।'

পদ্ম নাত

ব'লেই পকেট থেকে একমুঠো আধপোড়া সিগারেট বের করলো। অরুণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ও গুলো আবার কি?'

'মুখপোড়া ত্র্যাণ্ড, হুবিধে অনেক—অফারের বালাই নেই। দেশলাই!'

অরুণ একটু হেসে বললো, 'ঠিক আগের মতোই আছে দেখছি। বাক, তোমার সঙ্গে সন্ধ্যার কোথায় দেখা হতে পারে বলতো?'

'যে কোনো অস্থানে হুস্থানে।' হুশাস্ত জবাব দেয়।

'বেশ তো, এসো না 'ন্যানকিন'-এ, সন্ধ্যা সাতটায়—কেমন এই কথা রইলো।'

'অতীব আনন্দের কথা।'

'আচ্ছা, সো লঙ্—'

'বাই বাই'

সন্ধ্যার পর চিনা রেস্তোরাঁর একটি টেবিলের কাছে অরুণ তারই মতো অল্প একটি স্ট পরা বুবককে নিয়ে হুশাস্তর জন্তে অপেক্ষা করছিলো। হুশাস্ত আসতেই তাকে সাহেবি কেতায় অভ্যর্থনা ক'রে প্রাথমেই পরিচয় করিয়ে দিলো পাশের বন্ধুটির সঙ্গে। 'মিঃ হুলালিত ঘোষ—মিঃ হুশাস্ত সেন।'

মিঃ ঘোষ হুশাস্তর মুখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো হাওসেক করতে। হুশাস্ত অরুণের যে হাতটা ব'রে ছিলো টক ক'রে তুলে মিলিয়ে দিলো ঘোষের হাতের সঙ্গে। নিজে দু'হাত তুলে জানালো নমস্কার। ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে ঘোষ ও অরুণ দু'জনেই হেসে উঠলো।

অরুণ হুশাস্তকে বললো 'তোমার নাম হুশাস্ত না হয়ে হওয়া উচিত ছিলো অল্প কিছু।'

পদ্ম নাভ

‘বার কোবে কোবে ধান, তারই নাম বেদানা—জগতে নিয়মই এই।’ হুশাস্ত জবাব দিলো।

বয়স আসতেই অরুণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো হুশাস্তর মুখের দিকে। হুশাস্ত বললো, ‘ভুল্ক।’ মিঃ বোষের দিকে চাইতে সে বললো, ‘ডিটো’। অরুণ অর্ডার দিলো, ‘তিনঠো বিয়ার—বাক এখন ইনটারেস্টিং টক শুরু করা বাক।’ হুশাস্তর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো ‘বিবাহ কার্খটা শেষ করেছ?’

‘করিনি, করবার আয়োজন চলছে। আজও একখানা কটো পেয়েছি ঢাকা থেকে।’

অরুণ হেসে বললো, ‘কিন্তু জানো, বোষ আমার হাত দেখে বলেছে বৌ নাকি ভারি সুন্দরী হবে আমার।’

হুশাস্ত সোৎসাহে ব’লে উঠলো, ‘আপনি হাত রেখতে জানেন?’ ব’লেই ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো বোষের সামনে।

গেলাসে খুব একটা লম্বা টান দিয়ে বোষ হুশাস্তর হস্তরেখায় মনোনিবেশ করলো। একটু বিচারের ভঙ্গি ক’রে বললো, ‘ওয়াইফের মেন্সটা খুবই ভালো। আপনার প্রতি য়াটাচমেন্ট থাকবে অস্বাভাবিক স্বকন্মের, অর্থাৎ, আপনারা বাকে বলেন চবিজ, সেটি হবে অতি চমৎকার।’

‘সেচ্ছার না বাধ্য হয়ে?’

‘তার মানে?’ বোষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

‘মানে, হতে পারে, এমনি একটা চেহারা হবে, দেখে চরিত্রে আঘাত করার আগ্রহই হবে না কারুর।’

অরুণ ও বোষ একযোগে হেসে উঠলো। হুশাস্ত হাত টেনে নিয়ে প্রশ্ন করলো, ‘মিঃ বোষ আপনিও কি বিয়ে করেন নি।’

পদ্ম নাভ

ঘোষ কোন্ করে ছাড়লো একটা দীর্ঘবাস।

অরুণ বললো, 'কিছুদিন ব্যবৎ ঘোষের বিরাট একটা বৈরাগ্য এসেছে নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে, বিয়ের কথা বললে তো কেপেই ওঠে।'

স্বশান্ত অন্ত্যস্ত আশ্চর্য হওয়ার মতো চেহারা ক'রে বললো, 'তাই নাকি! কেন মিঃ ঘোষ?'

ঘোষের চোখ মুখ ছলছলিয়ে উঠলো। 'সে বললো, 'স্বশান্তবাবু একদিন আমিও এসব কথা বলতাম। প্রাণে আমারও স্মৃতি ছিলো প্রচুর, কিন্তু—'

স্বশান্ত ঘোষের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, 'বে সব ছুঃখ ভেসে ওঠে, সে তো হাল্কা ছুঃখ, তা নিয়ে আর নাই বা বাঁটলেন। ভল্লুক পেটে ঢুকলে আমার ছুঃখ বা আনন্দ কোনোটাটাই হয় না। আমার শুধু ইচ্ছে করে অদ্ভুত একটা কিছু করতে। বাঙালী জীবনের একঘেয়েমি আমার কাছে মনে হয় অসহ্য। স্ববিরতকে আমরা বলি গান্ধীর্ষ। বিশ বছরের মধ্যে, বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে পাশাপাশি বসে, চলে, পড়ে, কিন্তু কোনো ছুঁটনা ঘটে না। সবাই শান্ত, সুবোধ, সুশীল। এক এক সময় জুঁজ হয়ে বিনি ভল্লুকে পর্বস্ত কত কি ক'রে কেলি। সেদিন হোটেলের কামরায় পকাশটা পেরেক ঠুঁকে পাঁচ টাকা জরিমানা দিয়েছি। ন্যানেজার টাকা নিতে এসেছিলো ই। করা পকেটের মুখে কেলি দিলাম জলতি সিগারেট, তা নিয়ে হয়ে গেল একটা বিরাট ঝগড়া। বেশ লাগে একটা একসাইটিং সমঝিৎ একটা ঝিল—'

অরুণ বললো, 'তুমি স্মিত্রা সেনের সঙ্গে পরিচয় করো, বনবে ভালো। হাসিকে সব প্রেবের গল্প ছাড়ছেন, ফল অব ঝিল এও

পঞ্চদশ

গ্যাডভেলার। কিন্তু দুঃখ ভাই, সবই গলে আর সিনেমায়, বাস্তবত
ভাগ্যে ছোট্ট না কিছুই।’

‘ছোট্টবার সাহসই বা কই তোমাদের? তোমার ঐ স্মিত্রা সেনকে
আমি জানি, অমন ডঙ্কন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আমার আছে।’

‘তুমি গ্যাডদিন ছিলে বর্মায়, তুমি ওকে জানলে কি ক’রে?’

‘জানি হে জানি। ওর গত মাসের গল্পটা, বার মধ্যে বিবাহিতা
মহিলাটি পালিয়ে গেল স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে—সেতো আমাকে উপলক্ষ্য
ক’রেই লেখা।’

অরুণ বললো, ‘এমনিই তো মিথ্যে বলতে বাধে না, তার ওপর
নেশার ঝোঁকে খুব যে ব’লে চলেছে!’

‘শুধু পরিচয় নয় হে, একটু ইশারায় তোমার স্মিত্রা সেন কেন
অমন অনেক কেউ অনেক কিছু করতে রাজি, তবে কিনা—’

অরুণ বাধা দিয়ে বললো,—‘এসব লম্বা-লম্বা নেশাখুরী বড়াই ছেড়ে
অল্প কথা বলো।’

স্বশান্ত টেবিলের উপরে মাসটা চেপে ধ’রে চেয়ারের পেছনে
হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললো, ‘জাখো, কেপিও না, গ্যাডভেনচারাল
মুডএ আছি। কি ক’রে বসবো ঠিক নেই।’

অরুণ জোর দিয়ে বললো, ‘ক’রে একবার দেখাওই না, মুখের
বড়াই তো ঢের শুনলাম।’

টেবিলের উপর চাপড় দিয়ে স্বশান্ত বললো, ‘বেট, কত বাজি
বলো।’

‘একশো টাকা—স্মিত্রা সেনকে নিয়ে এম্বুনি যদি একবার বেকতে
পায়ো। সঙ্গে বইলেন পিশে—ভেমন বেকনো নয়। এমনি ভাবে

বেকতে হবে, তোমাদের রিলেশানটা ঠিক যেমনটি বলেছে—না পারলে একশো ঘেবে।’

ঘোষ ভীতকণ্ঠে ব’লে, ‘ধাক না বাপু এসব—’

‘শাট আপ ম্যান। রিস্ক তো ওর, লেট আস এনজয় দি কান; আই’ম হ্যাপি হুশাস্ত উইল লুজ।’ হুশাস্তকে লক্ষ্য ক’রে বললো, ‘মুখের কথাই চলবে না। ঘোষ মিডল্ ম্যান, দুজনকেই টাকাটা জমা রাখতে হবে ওর কাছে।’

হুশাস্ত জবাব দিলো, ‘বহঃ আচ্ছা।’

যার যার গেলাস মুহূর্তে শুবে নিয়ে তিন বন্ধু বেরিয়ে এসে ধরলো ছুটো ট্যান্ডি। হুশাস্ত অরুণ ও ঘোষকে ব’লে দিলো, তার ট্যান্ডি বে-বাড়ির সামনে গিয়ে ধামবে দেখান থেকে অনেকটা দূরে গাড়ি রেখে তারা যেন কোনো এক জায়গা থেকে লুকিয়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করে; এবং পরেও অনেকটা পেছন থেকেই যেন তাকে অহুসরণ করা হয়। হুশাস্তর গাড়ি চললো আগে, পিছনের গাড়িতে অরুণ আর ঘোষ। ঘোষকে দেখলেই মনে হয়, তার দুঃখের সঙ্গে মিশেছে ভয়ানক একটা ভাবনা।

অরুণ ঘোষকে বললো, ‘হুশাস্ত মনে করছে যাকে-তাকে দেখিয়ে বাগ্মী মারলেই চলবে। হুমিত্রা যে আমাদের পাড়ার মেয়ে। ব্যারিস্টার মিঃ দাশগুপ্ত হলেন হুমিত্রার দাদা। কিছুদিন হলো তারই কাছে বেড়াতে এসেছে। আমি যে এত খবর রাবি হুশাস্ত ভাবতেই পারে নি।’

কথার প্রত্যুত্তরে ঘোষ শুধু বোকায় মতো ধানিকটা হাসলো।

অন্ধকার রাত্রি। দশটা তখন বেজে গেছে। বাসিগঞ্জের যে

বাড়িটার কিছু দূরে হুশান্তের গাড়ি এসে থমকে দাঁড়ালো। সেটাই নিঃশব্দতার বাড়ি। মাঝখানে মস্ত একটা বাগান পড়ে বাড়িটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে পল্লী থেকে। তার পরে একটা বাড়ি আদ্বৈতের উঠে থেমে রয়েছে। সেই বাড়ির কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারকে কি বেন বলে হুশান্ত নেমে পড়লো। অরুণ ও ঘোষ আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালো। সেই আদ্বৈত-ওঠা বাড়িটারই একটা ধানের আড়ালে, যেখান থেকে দাশগুপ্তের বাড়ির প্রায় সবটাই দেখা যায়। একতলা বাড়ি—সমস্ত বাড়িটা নিগুহ। বাইরে থেকে সানি দিয়ে যে আলো দেখা যাচ্ছে তাই থেকে বুঝা যায় কেবলমাত্র দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। হুশান্ত পা টিপে টিপে জুতোর শব্দ বাঁচিয়ে কোমর অবধি উঁচু দেয়ালটার সামনে গিয়ে সেটাকে টপকে পড়লো গিয়ে বাগানের ভেতর। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে এ পাশের যে ঘরটায় আলো জ্বলছিলো তারই দরজায় আস্তে আস্তে বার ছুঁই মারলো ঢোকা। চেহারার ভালো করে না দেখতে পেলেও অরুণ ও ঘোষ বেশ বুঝতে পারলো, যে দরজা খুলে দিলো সে জীলোক। হুশান্ত তাকে ইশারায় চূপ করতে বলে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। একটু পরেই অরুণ ও ঘোষ দেখতে পেলো বাড়িটা নিভে গেলো।

ঘর থেকে হুশান্ত মেয়েটিকে নিয়ে বাগানের অন্ধকার জায়গা দিয়ে সেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর নিঃশব্দে সেট খুলে তার হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। ট্যান্ডির সামনে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে কি বেন বলতে যাচ্ছিলো, হুশান্ত হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলো। ট্যান্ডিওলা দেখে শুনে দাবড়ে গিয়ে কিছু বেন বললো।

হুশান্তর অবাবটাও বোকা গেল না, শুধু দেখা গেল হুমিত্রাকে অনেকটা বেন আল্লা ক'রে তুলে নিয়ে পাড়িতে বসিয়ে দিলো, তারপর পাশে ধপ ক'রে ব'সে পড়লো সে নিজে।

অরুণ ও বোব রীতিমতো শক্তিত হয়ে নিজেদের পাড়ির দিকে এসিয়ে গেল।

হুশান্তর ট্যান্ডি ছেড়ে দিলো। পাড়িতে ব'সে হুমিত্রা জিজ্ঞেস করলো, 'এ কি কেলেকারি করলে বলতো, এখন বাড়িতে কি একটা ব্যাপার হবে ভাবতে পারো?'

'কোনো চিন্তা নেই, সে-সব আমি দেখবো।'

হুমিত্রা হতবুদ্ধির মতো পাশে ব'সে রইলো। তার মুখ চোখ দেখলেই বুঝা যায় সে ভরানক ভয় পেয়েছে। পাড়ি এসে দাঁড়ালো লেকের পার একটা গাছের নীচে। হুশান্ত হুমিত্রাকে আরও আশ্বস্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রে টেনে নিলো তার কাছে। অদূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অরুণ ও বোব মুখ চাওরাচাওরি ক'রে কেললো বীর্ঘবাস।

একটু পরেই হুশান্ত এসে বোবের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিলো বাজির টাকাটা।

হুমিত্রার বৌদি দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবার দরকার আছে, না সাহিত্যেই পেট ভরবে? ব'লেই ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বললেন, 'একি, ঘর বে অন্ধকার, এত নিগদিরই ঘুম?'

বাতি জালিয়ে দেখলেন ঘরে কেউ নেই। একটু নজর করতেই

দেখতে পেলেন বিছানার উপর প'ড়ে রয়েছে একখানা চিঠি। লেখাটা হুমিড্রার হাতের। চিঠিতে লেখা রয়েছে, 'আমি চললাম। আমাকে খোঁজ করতে গিয়ে অনর্থক কেলেঙ্কারি বাড়িও না। বাই করি, যেখানেই বাই, কাল ভোরেই তোমাদের জানাবো। ঠকে আমার শেষ প্রণাম জানিও। ইতি।'

ব্যারিস্টার-পত্নী হস্তদস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে খবর দিলেন স্বামীকে। তারপর উভয়ের মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। চাকরদের অলক্ষ্যে সমস্ত বাড়িটা মিঃ দাশগুপ্ত একবার খুঁজে এলেন। ব্যর্থ হয়ে পাগলের মতো বারাণ্ডার এ-মাথা ও-মাথা করতে লাগলেন পায়চারি।

স্বামী বললো, 'একবার ওর বরকে খবর দিলে হয় না?'

ব্যারিস্টার সাহেব ধম্কে উঠে বললেন, 'তুমিই সব কিছুই জ্ঞে দায়ী। জোর ক'রে তুমিই তো ধ'রে এনেছ ওকে বেভাবার জ্ঞে।'

'আমি কি জানতাম এমন হবে?'

'আমি ঠিক বুঝেছি কোন হতভাগার সঙ্গে গেছে—যেদিন থেকে সাহিত্য তত্ত্ব করেছে সেদিন থেকেই জানি জাহান্নামে যাবে।'

'কিন্তু হুমিড্রা তো তেমন মেয়ে নয়।'

ব্যারিস্টার সাহেব ধম্কে উঠে মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, 'যাও আর ঝাঝি করতে হবে না, তোমরা সব সমান।'

এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর একখানা ট্যাক্সিকে দেখা গেল বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে।

দাশগুপ্ত ও তাঁর পত্নী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে সে দিকে তাকালেন। একটি বুঝ এবং বুঝী গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি বিদায় ক'রে দিলো। বাড়ির ভেতর ঢুকে সচীন এসে উপস্থিত হ'লো বারাণ্ডায়। মিঃ

পদ্ম নাত

দাশগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে শ্রুশাস্তকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার সঙ্গে ওর দেখা হলো কোথায় ?'

'আমার সঙ্গেই তো গিয়েছিলো।' একটা চেয়ার টেনে শ্রুশাস্ত বললো।

'নিজের বৌকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো, সে-কথা মানি, কিন্তু আমাদের এরকম এ্যাডুসাইটিতে ফেলবার তোমার কোনো রাইট নেই।'

শ্রমিত্রার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমারই বাকি রকম আভেল বলতো ?'

শ্রমিত্রা বলে উঠলো, 'আমার কি দোষ, আমাকে কিছু বলতে বা করতে ও সময় দিলো কই। জোর ক'রে নিয়ে চুকিয়ে দিলো গাড়ির ভেতর।'

শ্রমিত্রার বৌদি চিঠিখানা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু এই চিঠি—'

'চিঠি ?' শ্রমিত্রা চমকে উঠলো।

জবাব দিলো শ্রুশাস্ত। 'চিঠিটা ওর গল্পের খাতা থেকে ছিঁড়ে আমি রেখে গেছি—দেখো, নীচে নাম নেই। বুঝলে বৌদি, শ্রমিত্রার গল্পের নায়িকাদের অনেক খুঁজেও পেলাম না। গল্প প'ড়ে এদিকে মাথা হয়ে আছে গরম, একটা কিছু না করলেই নয়। নায়িকাদের অভাবে চূপ ক'রে থাকবো, ভাবলাম তার চাইতে নিজের বৌকে নিয়েই ইলোপ করা যাক।' মিঃ দাশগুপ্তকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'রাগ কোরো না ব্রাদার, এমনধারা বিপদের খাদটা নিবিয়ে গেয়ে যাওয়া কম লাভের কথা নয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মাপ করতে হচ্ছে, নোডে বন্ধুরা ঠাণ্ডিয়ে আছে, চা-এর নেমস্তন্নটা ওদের ক'রে আসি। এমন একটা স্বকর্ষে উৎসাহ দিতে গিয়ে যে-টাকাটা ওরা হাতছাড়া করেছে তার কিছুটা ওদের খাওয়ানো উচিত।'

স্মৃতি

নাম তার স্মৃতি। দিনের বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় স্মৃতি জানালার পাশে বসে আছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। টানা-টানা জ্বর নীচে স্থলর এক জোড়া চোখ। দৃষ্টির মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। সামনে-চাওয়া-কটোর চোখের মতো সে-চোখ সবাইকে সমান ভাবে লক্ষ্য করে, যেদিক থেকেই তাকায় মনে ভাবে তারই দিকে ওর দৃষ্টি। অধিকন্তু চাউনির মধ্যে একটা ত্রিভুজ আবেশ মাথানো ভাব আছে যা তুল বুঝবার পক্ষে সাহায্য করে সবচাইতে বেশ। সাধারণ দৃষ্টিতে স্মৃতিকে বেশ সন্দেহী ব'লে মনে হয়। নাকের উচ্চতা স্বাভাবিকের মাত্রা ছাপিয়ে গিয়ে থাকলেও অহম্মরের গতিতে গিয়ে পড়ে নি।

তথু যে আশপাশের বুকদের নিকটেই স্মৃতি স্থপরিচিত তা নয়, ও পথ দিয়ে সচরাচর বারা চলে তারাও উল্লম্বী হয়ে জানালাটার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ না ক'রে যায় না। একদিন স্মৃতির নামে এক-খানা উড়ো চিঠি এল। কার্ডে লেখা। এ ভাবে চিঠি পাঠানোর কচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক পিঠে তার চলচ্চিত্রাকারের একটি নারী তারকার চিত্র, অপর পিঠে গুটিকয় আপত্তিজনক নিবেদন ও আবেদন। কার্ডে লেখা, অতএব গোপন করার স্মৃতিসন্ধি নেই, এ একটা প্রকৃত কৌতুক, নয়তো অব্যবহিত বাসনার এক বিকৃত প্রকাশ। সে বা-ই হোক, এ চিঠি আসার পর প্রতিবেশীদের পরম পরিচিত মুগল নয়ন

পদ্ম নাভ

স'রে গেল দৃষ্টির আড়ালে, তার স্থানে বহু গবাকের অগণিত নরন
উন্নীলিত পল্লব নিয়ে তাকিয়ে রইলো রাত্তার দিকে।

চিঠিটা পড়েছে স্মৃতির মা'র হাতে। স্মৃতির মা সৌদামিনী
অত্যন্ত রাগভার্য প্রকৃতির, সমস্ত পরিবারটা চলে তাঁরই নির্দেশে।
বাবা বৌয়েশবাবু নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় লোক, তাঁর অতিশয়ের মূল্য এক
সওদাগরি আপিসে দেড়শো টাকায় বার্ষ হয়ে গেছে, তার বাইরে
কোথাও হতে কোনো মূল্য তিনি দাবিও করেন না। সৌদামিনীর
পারিবারিক অস্থ্যাসন যেনে পুঙ্ককৃত্যাদের সঙ্গে নিচ্ছিন্ন মনে দিন
অতিবাহিত করেন। সৌদামিনী আধুনিক ভাবধারার মোটেই
পক্ষপাতী ন'ন, নারী-পুঙ্কবের অবাধ বা সবাধ মেলামেশা কোনোটাই
তিনি পছন্দ করেন না। মেয়েদের চালচলনের উপর তাঁর প্রথম দৃষ্টি ;
হঠাৎ এই চিঠির আবির্ভাব সেই ধর দৃষ্টিকে ধরতর ক'রে তুললো।
জানালাটা সজোরে বন্ধ ক'রে দিয়ে সৌদামিনী স্মৃতিকে নিয়ে
পড়লেন। খুব শক্ত রকমের বকুনি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন
ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটলে আচ্ছা ক'রে মার দিয়ে বাড়ি থেকে বা'র
ক'রে দেবেন।

শান্তির শেষের অংশটা বিশ্বাস না করলেও প্রথমংশ স্মৃতি
মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। বকুনি খেয়ে স্মৃতির মন বত খারাপই
হয়ে থাক, তার উদ্দেশ্যে কে একজন চিঠি দিয়েছে তাবতে গিয়ে
ওবই মধো মনে-মনে সে একটু গর্ববোধ না ক'রে থাকতে পারেনি।
এখন স্মৃতির বেশির ভাগ সময় কাটে তিতরের দিককার বারান্দায়
সাংসারিক কাজকর্ম নিয়ে। লেখাপড়ার দিকে আকর্ষণ তার কোনো
কালেই নেই, ফুলে বাওয়া প্রায় বন্ধই ক'রে দিয়েছে, প্রাইভেট পড়েই

পঞ্চদশ

নাকি ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা সে পাশ করবে। সন্ধ্যা বেলা নীলা ও ইলা যখন ফুলের পড়া তৈরী করতে বসে, হুরভিও একখানা বই ফুলে বসে তাদের পাশে।

হুরভি, নীলা ও ইলার পড়াশুনা ত্যাগবাহনের তার কিছুদিন থেকে তাদের ন'কান্ অজিতের উপরই গুরুত্ব আছে। অজিত ধীরে ধীরে জাতি সম্পর্কে ভাই, কলেজ থেকে বেরিয়েই কলকাতা এসেছে চাকরির খোঁজে। খোঁজ করলে চাকরির খবর মেলে কিন্তু চাকরি মেলে না এটা আবিষ্কার করার পর থেকে অতবড় একটা অনিশ্চয়তার পিছনে ছুটে বেড়াবার আগ্রহ তার মনে থেকে উবে গেছে। বাড়িতে ব'সে-কাটানোটা তার চিরকালে অভ্যাস, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তে যেটুকু দৈনিক সকাল প্রয়োজন সেটুকু অজিত হস্তপরিমিত স্থানের মধ্যে কতকগুলো প্রক্রিয়া দ্বারা বজায় রেখে চলে। অজিত একটু অসামাজিক, বাইরের দশজনের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা সে কোনো কালেই করতে পারে না। বিশেষ ক'রে অপরিচিত মেয়েদের সংস্পর্শে আসাকে সে মনে করে ভয়াবহ। অনাস্থিয়া তো দূরের কথা, আস্থিয়াটা একটু দূর হলে পর্যন্ত চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে অজিতের বেশ কিছুটা দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। এ দিক দিয়ে তাই তার একটু সুনামও আছে। হুরভি, নীলা ও ইলাকে নিয়ে যখন সে রাস্তায় বের হয় মুখখানাকে ক'রে রাখে জমাট ও অভিব্যক্তিহীন। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তা চলে, পরিচিতদের পাশ কাটিয়ে যার অপরিচিতদের মতো—কারণ সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে; এমনি গুরুতর সে মেয়েদের সংস্পর্শে।

সৌদামিনীর বিশেষ স্নেহের পাও অজিত। সৌদামিনীর শ্রীতি ও

সহানুভূতি এ পরিবারে শান্তিতে দিন কাটাবার পক্ষে বঞ্চে। অজিত পরিবারের মধ্যে চলে ফেরেও খুবই সহজভাবে। হয় রাস্তাঘরে বৌদির কাছে ব'লে গল্প করে নয়তো ভাইবুঁদের নিয়ে হৈ-হাজার সময় কাটার। ইলা ছোট তাই বড় একটা পাত্তা পায় না, নীলা মাঝারি, তাকে খেপিয়ে বেড়ানো অজিতের মস্ত এক কাজ। বিহুনি ধ'রে টান দেওয়া, ছ'হাতে তুলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে ধুপ ক'রে ফেলা, কখনো গালে দাড়ি ব'বে দেওয়া, একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে। নীলাও দিনের ভিতর দশবার ছোট্ট নাকি মা'র কাছে নাগিশ জানাতে। হডোহড়ি কাড়াকাড়ি চলে সুরতির সঙ্গে। সামান্য একটা চুলের ফিতা বা ন'কানুর রচিত দশবার পড়া একটা কবিতাকে উপলক্ষ্য ক'রে ধস্তাধস্তি চলতে থাকে, হয়তো বস্তাটিকে জয় করবার জন্তেই সহজে শেষ হ'তে চায় না। সম্মেল তিরস্কারে সৌদামিনী বলেন—কি দস্তিই হয়েছে এগুলো, এদের জালায় আর বাড়িতে টেকা যাবে না—

চিঠির কথা অজিত জানে না, শুনলে কোণে নিরর্থক হটকই ক'রে বেড়াতে। কিন্তু সুরতির সামান্য পরিবর্তনটুকু সে লক্ষ্য করেছে। তাই সন্ধ্যায় পড়াতে ব'লে জিজ্ঞেস করে—কিরে এমন মুখ গোমড়া ক'রে আছিল কেন, কি হয়েছে?

সুরতি যেমন ছিল তেমনি বইএর উপর ঝুকে রইলো। জবাব দিল নীলা, বললো—মা বকুনি দিয়েছে।

—কেন?

কিছু একটা জবাব দেবার পূর্বেই পাশের রুক থেকে হারমনিয়নের সুর ভেসে আসে, তিন বোন উৎকর্ষ হয়ে ওঠে। ইলা সোজা হয়ে ব'লে বলে—অনিলেশবাবু গান গাইবে, না-রে দিদি—কি মজা!

পন্ন না ভ

অজিত ধনক দিয়ে বললো—রাখো মজাটা দেখাচ্ছি। বা লিখতে দিয়েছি লেখ্ ব'সে লিগগির। তারপর ভ্রুকৃষিত ক'রে বলে, এ ভক্ত-লোকেরও সময় অসময় নেই, পড়াশুনোর সময় শুরু ক'রে দেয় পান।

নীলা বললো—মাঝে মাঝে তো গায়, বডদা বলে অনিলেশবাবুর মতো গাইতে পারলে সব ছেড়েছুড়ে কেবল নাকি গানই গাইতো।

—পাকামো না ক'রে ব'সে পড়ো। ব'লে অজিত গুন্ন হয়ে বলে রইলো। পান তখন শুরু হয়ে গেছে। এক একটা টান অজিতের নিজের কানেই এত ভাল লাগলো যে অসোয়াস্তি বোঝ না ক'রে পারলো না।

মনে মনে উৎসাহ এবং আগ্রহটা সবচাইতে সুরভিরই বেশি কিন্তু সেটা প্রকাশ করার উপায় নেই। কিছুদিন পূর্বে সামান্ত ব্যাপার নিয়ে অনিলেশের উপস্থিতিতে ও-বাড়ি যাওয়া তার নিষিদ্ধ হ'য়ে গেছে। আগে অনিলেশ বাড়ি আছে জানলে স্বযোগ পেলেই সে ছুটে যেত অনিলেশের বৌদির সঙ্গে গল্প করতে। অবশ্য সৌদামিনীর ভয়ে অনিলেশের সঙ্গে কথা কোনো দিনই বড় একটা বলে নি। তা ছাড়া সুরভির কেমন একটা ধারণা জন্মেছে অনিলেশ লোকটা ভারি দেখাকে, আশপাশের কাউকে যেন গ্রাহ্যই করতে চায় না। একদিন অনিলেশ বাইরে যাবার মুখে বৌদিকে ডেকে পান চেয়েছিলো। পান তখন বরে ছিলো না, কিন্তু সুরভি উপস্থিত ছিলো, ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে চ'বিলি পান নিয়ে এল। অনিলেশ দাঁড়িয়েছিলো বারান্দায়, পান ছুঁতো বৌদির নারফং না পাঠিয়ে স্বথতি নিজেই দিলো তার হাতে। ছোট একটি স্নগ্ধবাদ জানিয়ে অনিলেশ বেরিয়ে গেলো।

ছ'বাড়ির মাঝের ধোলা দরজা দিয়ে ঘটনাটা দেখে অজিত গুন্ন

হয়ে গিয়েছিলো। পান দান ব্যাপারটা অনারসেই সে প্রাণ দান পৰ্বন্ত গড়াতে পারে সে দূরদৃষ্টি অজিতের আছে, তাই কথটা সৌদামিনীর কানে তুলে সাবধান ক'রে দিতেও ক্রটি করে নি।

কোনো একটা ঘটনা যখন ঘটবার হয় আপনা থেকেই পারি-পারিক অবস্থাটা গ'ড়ে উঠে তার অস্বস্তি হয়। অনিলেশের সঙ্গে বনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার মতো সময় ও সুযোগ যে সুরতি পেতে পারে এটা সে কল্পনায়ও স্থান দেয় নি। হঠাৎ তার ছোটমাসী অস্বস্তি হয়ে কলকাতা এলেন চিকিৎসার জন্তে। সৌদামিনী এ বোনকে কোলে-পিঠে ক'রে মাথায় করেছেন, তাই যতটা একটু বেশি। নিজে যাতে সকল সময় দেখাশুনা করতে পারেন তার জন্তে বাড়িও নেওয়া হয়েছে নিকটেই। যথাকালীন কাজকর্ম শেষ ক'রে সৌদামিনী অজিতকে নিয়ে চ'লে গেলেন বোনের বাড়ি। কি একটা উপলক্ষ্যে ইস্তফা কিছু দিনের জন্তে বন্ধ তাই নীলা, ইলাও ছিলো বাড়িতে। ব্যারামটা নাকি তেমন ভাল নয় তাই তিন মেয়েকে সৌদামিনী রেখে গেলেন খান্ডড়ীর হেফাজতে।

অপরিসিত শাসনেব নীচে কস্তারয়ের মন কতোটা কোণঠাসা হয়ে থাকে ধরা পড়ে মাতার অন্তঃপন্থিতে। তিনটি প্রাণী যেন বাড়িতে ঝড় বইয়ে দিলো। রাতারাতি সমগ্র ভারতবর্ষটা স্বাধীন হয়ে গেলে ব্যাপার কি ঘটবে এ যেন তারই একটুকরো নমুনা। পিতামহীর চোখ নেই, তাই চোখে ধুলো দেবার ভাবনাও নেই। সুরতি চ'লে এল অনিলেশদের বাড়ি। অনিলেশ বাড়িতেই ছিলো, জিজ্ঞাস করলো— বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি? সুরতি অনিলেশের চোখে দিকে তাকিয়ে মুহূ হাসলো, কিছু জবাব দিলো না।

পদ্ম নাভ

অনিলেশের বৌদি বললো—মা বাড়ি নেই বুঝি।

একটু পরে নীলা, ইলাও এসে উপস্থিত হলো। দেখতে দেখতে সমস্ত আবহাওয়াটাকে ক'রে তুললো ওরা হাল্কা ও মধুর। স্বরতি অনিলেশকে অহরোধ জানার একটা গান শোনাতে, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দেয় যে স্বযোগ পেলে সে অনিলেশের কাছে গান শিখতো। স্বরতি যে এমন সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে অনিলেশ ভাবতেও পারে নি।

পরের দিন স্বরতি ও অনিলেশের পরিচয়টা হলো আর একটু গভীর। অনিলেশের মনে হয় স্বরতি যেন একটু সহজলভ্য। আবার ভাবে না-ও হতে পারে—হয়তো সময় ও স্বযোগ স্বল্প ব'লে গতিটা ওর একটু ক্ষুণ্ণ। সৌদামিনী নিয়মিত দুপুরে ষণ্টা দু'তিনের অন্তরে চ'লে যান ভয়ীর পরিচর্যা করতে, অতএব এদিকেও নিয়মে ব্যাঘাত ঘটাবার কোনো কারণ থাকে না।

একদিন অনিলেশ স্বরতিকে ছোর ক'রে ধ'রে বসে গান গাইবার অন্তরে। স্বরতি পালিয়ে বাবার ভান ক'রে অনিলেশ চট ক'রে তার হাতটা ধ'রে কেলে। স্বরতি মুখে বলে 'ছাড়ুন,' কিন্তু ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা সে করে না। অনিলেশ তর্জনী দিয়ে স্বরতির হাতের তেলোটা চুলকে দিয়ে চাপা গলায় বলে—বিলেতে অনেক লোকের সামনে এমনি ক'রে মনের কথা বলে।

—এটা তো আর বিলেত নয়। স্বরতি লজ্জিতভাবে জবাব দেয়।

—না হোক বিলেত তবু জবাব দিলে ঠিক বুঝবো।

অনিলেশ আশাহুরূপ জবাবও পায়। তারপর উভয়ের পরিচয়টা নিবিড় হ'তে বেশিদিন প্রয়োজন হয় না। জনের সম্মান পেলে

জনতা ভাল লাগে না, অনিলেশ ও সুরভি কেবলই আভাল খুঁজে বেড়ায়। শীতের দুপুরটা শুয়ে কাটানো যে সবচাইতে আরামপ্রদ সেটা ঘোষণা করে অনিলেশ চলে যায় নিজের ঘরে, সুরভি নীলা ও ইলাকে নিয়ে গল্প জমিয়ে বসে বৌদির সঙ্গে, এক ফাঁকে বাড়ি থেকে ঘুরে আসার নাম করে গিয়ে উপস্থিত হয় অনিলেশের ঘরে।

দিনের পর দিন সুরভির সঙ্গে পরিচয়টা নিবিড় হবার ফাঁকে-ফাঁকে দু'একটা ঘটনা সুরভি সম্পর্কে অনিলেশের মনে এক প্রতিকূল চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদিন সুরভির ঘাড়ের দিকে নজর পড়তে অনিলেশ বলেছিলো—গ্রীবা নারী রূপের একটা অঙ্গ, সেখানটা অমন অপরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। ব'লে স্থানটা ঢেকে দেবার জন্তে টান দিয়ে খোঁপাটা দিয়েছিলো খুলে। একটা ঢাকতে গিয়ে মুক্তিলাভ করেছে অন্তটা—এই নাকি কেশের সৌরভ। ব'লে টেবিল থেকে এসেলের শিশিটা তুলে কাত করে ঢেলে দিয়েছে সবটা সুরভির মাথায়।

সুরভির সাম্মিথ্যের নিবিড়তা থেকে তার অপরিচ্ছন্নতার যে মাত্রা অনিলেশের কাছে ধরা পড়েছে তাতে তার মার্জিত রুচি দম্বরমতো আবাত পেয়ে স'রে যেতে চেয়েছে। এ ছাড়া অনিলেশ যখনই সুরভির মুখখানা তাব চোখের সামনে তুলে ধরে, শুধু সুরভির নাক নয়, তার মুখের গঠন থেকেও কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকত্বের আভাস তার রূপকে ছাপিয়ে অনিলেশের চোখের সামনে ভেসে উঠে। সে-বস্তু কি এবং কোথায় তা নির্দেশ করবার ক্ষমতা অনিলেশের নেই। সে শুধু এটা উপলব্ধি করে। অনিলেশের মনস্তত্ত্বের কোন এক বই-এ পড়েছিলো, দৈহিক অস্বাভাবিকত্ব মাতৃষের প্রকৃতিকেও স্পর্শ করে—কথাটা স্মরণ করে মন তার ঘিঘায় ভ'রে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপভোগান্তে স'রে পড়বার মতো প্রকৃতি অনিলেশের নয়, তাই স্বরভির কোনো ক্রটি ও অভাবকে চিন্তার মধ্যে বড় স্থান না দিয়ে সে পারে না। একদিন আঁচলের কোণ ধ'রে টান দেওয়াতে স্বরভির কাপড়ের ঝানিকটা ফেঁসে গিয়েছিলো, মুহূর্তের ভরাংশমাত্র বে-ভাবটা স্বরভির মুখের উপর ভেসে উঠেছিলো, পরমুহূর্তের শত হাসি ও তাজিল্য তাকে মুছে দিতে পারেনি অনিলেশের মন থেকে। এমন-বারা ছোটখাটো বিষয়ের ভিতর দিয়ে নিজের অন্তরের সংস্কৃতির সঙ্গে স্বরভির অন্তরের ব্যবধানের পরিচয় পেয়ে অনিলেশ দুঃখ বোধ করেছে। এক-একদিন মনে করেছে নিজেকে প্রশ্রয় আর সে দেবে না, কিন্তু ভোবের জমাট সঙ্কল ছপূরের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় কোথায় যেন উবে গেছে। যুক্তি চেষ্টা যৌবন বার শক্তিমান, মনের অতৃপ্ত তরঙ্গটাকে প্রবোধ দিতে কোনো না কোনো যুক্তি তাকে খুঁজে বার করতেই হয়। অনিলেশ ধ'রে নেয় এটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাময়িক প্রভাব, তার জীবনের গতিতে এসে একবার পড়লে স্বরভি আপনা থেকেই তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠবে।

অনিলেশ ও স্বরভির হাবভাব ও গতিবিধি অনিলেশের মা ও বৌদির চোখ এড়ায় নি। অনিলেশের মা স্বরভিকে তেমন পছন্দ করেন না, অল্প ছাড়া ব্যাপারটা এভাবে পড়াতে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। ছেলেকে নিষেধ ক'রেও যখন ফল হলো না, কাউকে না জানিয়ে কখনো একদিন তিনি সখিস্তার সৌধামিনী'র কানে তুলে দিয়ে এলেন। তারপর মা ঘটলো সেটা সহজেই অজ্ঞেয়। স্বরভির প্রবণতায় ও দেহের উপর দিয়ে যতটা বর্ষণ সম্ভব বর্ষিত হয়ে গেল। খবর শুনে অজিত কিশোর মতো পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলো

বারান্দার। সৌদামিনীকে বুঝিয়ে দিলো যে স্বরভির কোনো অপরাধ নেই, অপরাধ বার, সেই রাসকেলটাকে সে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে। অজিতের মতে মেয়েদের মনগুলো হলো ছোট ছোট সামন্ত রাজ্য, প্রত্যেকটি পুরুষ এক একটি দুর্ধর্ষ সম্রাট, অভিযানে বেরলে যখন তখন দু'দশটা জয় ক'রে যে কেউ ধরে ফিরতে পারে। অজিতের মতো লোক বারা, ক্ষমতার অপব্যবহার তারা করে না। যে শ্রেণীর লোক এ জয়ের উপর কোনো কৃতিত্ব বা মূল্য আরোপ করে তাদের প্রতি অজিতের ক্রোধটা অপরিণীম।

অনিলেশ খবর শুনে মার প্রতি বধেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলো কিন্তু প্রতিবাদের নিরর্থকতা বিচার ক'রে একেবারে চূপ ক'রে গেছে। সূত্রভেদে বাড়ির আবহাওয়াটা কি প্রকার ধমধমে হরে আছে সে তা বাড়ি ব'সেই অনুভব করছিলো। অনিলেশ উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু একটা স্থির করবার চেষ্টা করছে এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে অজিত তার ঘরে ঢুকলো। অনিলেশের কাঁধে ধ'রে একটা কাঁকুনি দিয়ে বললো—এ সব কি ব্যাপার।

এই ধারণাতীত অসত্যতা ও গুণ্ডামির জন্ত অনিলেশ প্রস্তুত ছিলো না, সে গিল্মরে শুক হয়ে গেলো। তারপর অজিতের বীরবে বাবা দিবার জন্তে উভয় পরিবারের নারীকুলের আকুলি-বিকুলি চেষ্টা ও হৈ-চৈ মিলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করলো যে অনিলেশের মন ছি-ছি ক'রে উঠলো। সৌদামিনী অজিতকে জোর ক'রে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে শুধু অনিলেশকে নয় সমস্ত পরিবারটাকে কুংসিত অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ক'রে অজিত ধপাস ক'রে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। অসত্যতার ক্ষেত্রে অক্ষমতার গৌরব

পদ্ম নাভ

অর্জন ক'রে লাহিত ও অপমানিত অনিলেশ নিশ্চল হয়ে বসে রইলো তার ঘরে।

অজিতের অশ্রাব্য শব্দগুলো শ্রবণ ক'রে অনিলেশ ভেবে পেলো না এর পর লোকটা নিজেই বা পরিবারের মেয়েদের চোখের দিকে তাকাবে কি ক'রে, তারাই বা ওকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে কি ক'রে।

স্বরভির বডমা' বিকাশ পড়াভনা আর সাম্যবাদ নিয়েই যেতে থাকে, পরিবারের ব্যক্তি বা বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্রটা তার খুবই হালকা। পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে সমতলের বিরাট বস্তুকেও যেমন দৃষ্টিপথে খেলনার মত তুচ্ছ করা যায় জ্ঞানের স্ব-উচ্চ শিখরে বসে বিকাশ তেমনি পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক অনেক সমস্তাকেই তুচ্ছ জ্ঞানে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু স্বরভি ও অনিলেশের ব্যাপারটা এমন একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, যে বাধ্য হয়েছেই আংশিকভাবে তাতে যোগ দিতে হলো।

রাত্রে বাড়ি ফিরতেই সৌদামিনী এনে সবিত্তারে সমস্ত ঘটনা বিকাশকে বললো। বিকাশ অনিলেশের মুখ থেকেও ঘটনাটা শুনে এসেছে, সে-সম্বন্ধে কোনো আভাস না দিয়ে বললো—মূল বিষয়-বস্তুর জায়-অজায়ের কথা ভিন্ন, কিন্তু ভঙ্গলোকের রাগের প্রকাশ বা বিচার-পদ্ধতিটা ভঙ্গ রকমেরই হওয়া উচিত নয় কি ?

অজিত সৌদামিনীর পাশেই দাঁড়িয়েছিলো, বললো—যে রাসুকেল এমন কাজ করতে পারে তার সঙ্গে আবার ভঙ্গতা কি ! ভঙ্গতা যেখানে করার সেখানে আমরাও কম ভঙ্গ নই।

—ভঙ্গলোকের ভঙ্গতাটা স্থান মহাত্ম্য নয়, স্বভাব।

গল্প না ভ

—তুমি বোর ভক্ততা, আমি বুঝি এই ঘৃণি। ব'লে হাত উচু ক'রে দস্তা অজিত দেখিয়ে দিলো।

বিকাশ তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো—হ্যাঁ, এই করুন এখন, আগনি আমাদের হ'য়ে ওর নাকে দিন একটা বসিয়ে, ওর হরে আবার কেউ আমার নয়তো এমন কি বাবার নাকে দিক একটা বসিয়ে—এই চলুক। ভাববেন না ওর লোকের অভাব হবে, নিয়ন্তরে এধরনের বীরের অভাব নেই। যাক, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি? মা'র দিকে তাকিয়ে বললো, যাও দেখি এখন, আমাকে কাজ করতে দাও। ব'লে জোর ক'রে আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়ে বই খুলে সে পড়ায় মনোযোগ দিলো।

স্বরভির মনকে স্থস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার ভার নিলো অজিত নিজে। কাকুর সাহায্যও বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না, স্বরভির ভীতু মন শুধু কামনা করছিলো হান্ধামটা বাতে চুকে যায়। দিন দুই ধ'রে অজিত গভীর মুখে প্রহ্ন ক'রে স্বরভির কাছ থেকে তাদের খুঁটিনাটি সব কিছু ঘটনা জেনে নিতে থাকে, মাঝে-মাঝে নারী ও পুরুষের এ সকল দুর্বলতা সম্পর্কে দেয় নানা রকম উপদেশ।—জ্ঞ কুঞ্চিত ক'রে কোনো মেয়ের দিকে তাকালে তাতে তাকানোর অপবাদ থাকে না বটে কিন্তু আনন্দ থাকে। আলোচনার গাভীরের ভিতর থেকে কিসের একটা স্বাদ আলোচনাটাকে টেনে চলতে থাকে।

দু'চার দিনের ভিতর অজিত স্বরভিকে বেশ বুঝিয়ে দিলো অনিলেশ কত বড় অন্তায় করেছে তার প্রতি, এবং এসব লোক সমাজের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর। এত বড় একটা গণগোলে প'ড়ে স্বরভির মন এমনতেই মাঝে-মাঝে অনিলেশকে দায়ী করছিলো, তার উপর

পদ্ম নাভ

ন'কাকুর সঙ্গে কথা বললে মন তার দস্তর মতো বিকল্প হ'য়ে উঠলো অনিলেশের উপর। এ উপলক্ষ্যে স্মৃতির সঙ্গে অজিতের হৃদয়তাটা বেশ বেড়ে গেলো। বাড়ির আবগাওয়াও এল ক্রমশ হালকা হ'য়ে। তিন বোন মিলে সন্ধ্যাটা ন'কাকুর সঙ্গে হাসি গল্পে কাটিয়ে দেয়। স্মৃতি কখনও জোরে হেলে উঠলে অজিত মনে-মনে তারি সঙ্কট হয়, জানে অনিলেশের কানে পৌঁছলে এ তাকে নিশ্চয়ই আঘাত করবে।

পড়াশুনা শেষ ক'রে অনেক রাত অবধি স্মৃতি তার ন'কাকুর শিয়রে ব'লে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে সঙ্কারমাণ চক্কল হাত দু'খানা চোখের দু'পাশ দিয়ে অনেকটা নেবে এগে ঘুরে যেতে কখন অজিতের একখানি হাত বুকের কাছে ব'য়ে আঁতুলগুলো দেয় টেনে। এর মধ্যে স্থখ আছে কিন্তু বীকৃতি নেই—কোনো কথা না ব'লে অনেক সময় তারা কাটিয়ে দেয় এই ভাবে।

নেহাংই জ্ঞান সঙ্কয়ের উদ্দেশ্যে অজিত ছপূরবেলা শায়িত অবস্থায় নর-নারীর কোনো এক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানা বাংলা বই পড়ছিলো। স্মৃতি ঘরে ঢুকলো—কি বই ন'কাকু ?

অজিত বই বন্ধ ক'রে গম্ভীর মুখে জবাব দিলো—এ বই তাদের জন্তে নয়, বড় হয়ে পড়িন।

ছোটদের পড়া নিষেধ জনেলে পড়বার জন্তে আগ্রহে তাদের অন্ত থাকে না। স্মৃতি আবদারের সুরে বার বারে বলতে থাকে—বিন না একবার, কি এমন বই, আমি ছোট নেই সব পড়তে পারি—বিন না।

—বারশ করছি শুনছি না,—কখনও ছুঁবিনে এ বই। ব'লে বই খানাকে স্মৃতির উপস্থিতিতেই খোলা স্মার্টকেসটার মধ্যে রেখে চোখ বুজে ঘুমের আয়োজন করে।

পদ্ম নাভ

যশ্টি ছ'রের ভিতর সুরভিও পুঁথি খানা হতে যথাসম্ভব তত্ত্ব সংগ্রহ ক'রে নিতে ক্রটি করে না।

সেদিন সুরভির মাথাটা বড্ড ধরেছিলো তাই আর ন'কাকুর মাথায় হাত বুগিয়ে দেওয়া হলো না। খাওয়াদাওয়া সেরে সটান গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সে আশা ক'রে ছিলো যে ন'কাকু নিশ্চয়ই একবার খোজ নেবে। কিছুকণ পরেই অজিত ওরিয়্যানটাল বামটা হাতে ক'রে এসে বললো—দেখি, মাথাটা বের কর, মালিশ দিয়ে দিচ্ছি।

এক হাতে অজিত কপালে মলম ব'বে দেয় অপর হাতটা তার, হয়তো অসহ্য বেদনার দরুণ সুরভি চেপে ধ'রে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে সে হাতটা সুরভির বুকের উপর এসে স্থান নেয়, ওরা যেন জানতেও পারে না। ক্রমে অজিতের হাতটা তার সমস্ত বৃত্তিকে ভুচ্ছ ক'রে মন থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়।

পরের দিন অজিত সুরভির চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। সুরভিও চেষ্টা করে না সহজ ভাবটা ফিরিয়ে আনতে। কেমন একটা গ্লানি নিয়েই আজ সে শয্যা ত্যাগ করেছে। গতরাতে বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে কেবল অনিলেশকেই সুরভি স্বপ্নে দেখেছে। তার ব্যাঘা হয়েছিলো অনিলেশকে মন থেকে সে অনেক দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছে, কিন্তু আজ ঘুরে ফিরে কেবল তারই কথা মনে প'ড়ে বুকেটা যেন তার ব্যাঘা ভ'রে উঠতে লাগলো। প্রথম পরিচয়ের দিনটি থেকে একে-একে সে প্রত্যেকটি ছপুয়ের কথা চিন্তা ক'রে যেতে লাগলো, মন তার স্মৃতির মাধুর্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। অনিলেশের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা শুনবার অস্ত্রে সুরভি কান পেতে

রইলো। সেই অপমানজনক ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনিলেশের একটি কথাও তার কানে এসে পৌঁছয় নি, সে এখানে আছে কিনা তাও সঠিকভাবে তার জানা নেই। শেষ দিনের ঘটনা স্মরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বড়দা'র মুখের কয়েকটি কথা মনে পড়ে গেলো।

দিনকয়েক পূর্বে স্মৃতি তার ন'কানুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ঝিলঝিল ক'রে হেসে উঠছিলো। বিকাশ ডাক দিয়ে চাইলো এক সেলাস জল। স্মৃতি সেলাসটার জন্তে অপেক্ষা করছিলো, বিকাশ তার মুখের দিকে ঋণিকত্ব তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো— অনিলেশকে কেউ অপমান করলে তার উপর তোমার রাগ হয় না?

—যদি অন্তরই হয়ে থাকে তবে তার শাস্তি দিয়েছে ব'লে রাগ করবো কেন।

স্মৃতি যে কোনো উত্তর দিতে পারে বা মেবে বিকাশ ভাবতে পারে নি। একটু আশ্চর্য হয়ে স্মৃতির মুখের দিকে একবার তাকালো, তারপর বললো—‘যদি’ বতর্কণ রয়েছে মীমাংসার জন্তে অপেক্ষা করা উচিত ছিলো—আর রাগ যখন আপনা থেকে হয় নি তখন কর্তব্য হিসেবে না হওয়াই ভালো।—থাক, এসব কথা তুই বুঝবি নে— অনিলেশ ভুলই করেছিলো দেখছি, আচ্ছা বা এখন।—

সেদিন স্মৃতি বড়দা'র কথাগুলো ভেমন ক'রে মনে স্থান দেয় নি, আজ ভাবতে গিয়ে প্রত্যেকটি কথার মর্ম যেন সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলো।

বিকেলবেলা থেকে হঠাৎ স্মৃতি খুব হালকা ভাব নিয়ে অজিতের সঙ্গে হাসি গল্প জুড়ে দিলো। স্মৃতির এই স্বাভাবিক সহজ ভাবের আওতায় এসে অজিতের মন থেকেও সমস্ত দিনের মানি ও কুঠার

ভাবটা বেন অপসারিত হয়ে গেলো। সন্ধ্যা ঘনিরে আসতেই স্মৃতির
আবার মাথার বজ্রণা শুরু হলো। চোখের দরুণ মাঝে-মাঝে
সৌদামিনীও মাথার ব্যথার কষ্ট পান, তাই চিন্তিত হয়ে পরের দিনই
ভাস্কর ডেকে পরীক্ষা করানো মনস্থ করেন।

আজ স্মৃতি খেতে পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠলো না। অজিত
পড়ে গেলো মস্ত একটা দ্বিধার মধ্যে, পরিচর্যার ভার নিতে আজ সে
সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলো। কিন্তু একবার খোজ না নেওয়াটাই
বা বেন কেমন, আহা রাস্তা তাই মনের আগ্রহকে বধাসম্ভব শাসনে
সংযত ক'রে অজিত সসঙ্কোচে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—কেমন আছিল
এখন? মালিশ দেবার কথা মুখে আনতেও তার বাধলো।

স্মৃতি নিজেই অহরোধ জানালো ওষুধটা মাথিয়ে দেবার অন্তে।
বাড়ি পর্যন্ত নাকি তার ব্যথায় টন-টন করছে। লেপের আবরণ খেকে
মুক্ত ক'রে অনাবৃত স্বচ্ছদেশ অজিতের দিকে ফিরিয়ে স্মৃতি পাশ
ফিরে তুলো। স্ট্যাপওয়ারা একটা ঢিলে সেমি তার গায়, পাশ
ফিরেই ঘেরটা সামনের দিকে বুলে পড়ে—শিয়রে ব'সে অজিতের
মাথায় কিম্বদ'রে আসে, জোর ক'রে সে চেষ্টা করে চোখ ফিরিয়ে নিতে।

কাজকর্ম শেষ ক'রে সৌদামিনী বাতি নিভিয়ে স্মৃতির পাশে
এসে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকারে অজিতের সীমালঙ্ঘনেচ্ছ লুপ্ত
হাতটা স্মৃতির ও কাঁধে ক্ষুণ্ণভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। স্মৃতি
সেটাকে ধ'রে সামান্য একটু আকর্ষণ করতেই প্রাণের আবেগে
লুটিয়ে পড়লো সামনের দিকে—

ধীরে ধীরে স্মৃতি সৌদামিনীর একখানা হাত টেনে এনে রাখলো
তার বুকে।

পদ্ম নাভ

অজিতের স্মৃতি আঙুলগুলো ঘুরেবিরে এসে স্মৃতির হাত-
থানাকে চেপে ধরতে গিয়ে স্মৃতির অস্তিত্ব হয়ে গেলো—চকিতে
হাতের মুঠোটা শিথিল ক'রে দিয়ে অন্তপদে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে
গেলো।

সৌদামিনী বারান্দার এসে গভীরকণ্ঠে ডাকলেন—ঠাকুরপো!

অজিতের নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি তখন সিঁড়ির অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে
গেছে।



সওদা

মেয়েটিকে কোথায় বেন দেখিয়াছি।

একদিন রাত প্রায় বারটার ফুটপাথে একটি বুকের সঙ্গে—
হ্যাঁ, সে-ই। গরমের রাত, ঝাঝাঝা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সিগারেটে
টান পড়ায় একপাশে পাড়ি রাখিয়া নামিয়া পড়িলাম। দোকানপাট
সবই প্রায় বন্ধ হইয়া গেছে, মাঝে মাঝে এক-একটা পান-সিগারেটের
দোকান তখনও রাতের ঝন্দের ধরিবার আশায় অপেক্ষা করিয়া
আছে। সিগারেট লইয়া পয়সা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত
দিয়াছি ঠিক পিছনেই নারীকণ্ঠ শুনিয়া ধামিলাম। ‘এই বরফ ছায়?’
একটু সরিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, পাশে একটি বুক, দেখিলে মনে
হয় দু-জনেই কলেজে পড়ে। বরফের শুভ্র টুকরা হইতে এক কামড়ে
কিছুটা ভাঙিয়া নিয়া মেয়েটি বলিল, ‘শিগগির মল্লবাবু উঃ কি ঠাণ্ডা—
খান আপনি।’ আশ্রয় নয় তবে। দু-জনেই সহজভাবে আগাইয়া
চলিল—একটু আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। কিন্তু তরুণ তরুণীর
অধিক রাত্রে এই অবাধ গতিবিধির মধ্যে আর বাই থাক সরস
কৌতুক করিবার মতো কিছু ছিল না, ঐটুকু সময়ের ভিতর সেটা
উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাই সশ্রদ্ধ সরুগীর ঘটনা হইয়া বিয়ট্টা মনের
মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

আজও সঙ্গে আছে একটি বুক, কিন্তু সে-রাত্রে মাঝে দেখিয়া-
ছিলাম সে নয়। স্বগঠিত স্থলর মেহের উপর বেশ লম্বা, মাথার চুল

উক্ক খুন্স, সার্ট ও কাপড় বেশ মরলা বলা চলে, খালি পা, হাতে একটা বর্ষাতি—বার চেহারার ও চাকচিক্যে মালিকানা বস্তু সম্পর্কে মনে প্রশ্ন আসে। মেয়েটিকেও খার্ট বলা যায় না। ত্রামবর্ষ, চোখেমুখে ম্লান একটি বুদ্ধির ছাপ, ছেলেমানুষী ধরনে দু-পাশ দিয়া বুলাইয়া দিয়াছে লম্বা দুটা বিহুনি—এ বয়সের মেয়েদের মতো বড় একটা চলতি নাই, চোখে সাদা শরু ক্রেমের চশমা, খুবই সাধারণ একটি খাড়ির সঙ্গে হালকা একজোড়া স্লিপার—সব মিলিয়া মন্দ দেখাইতেছিল না।

একে একে খান দুই টেবিল পার হইয়া তারা আগাইয়া আসিল। বোধ হয় পাখার নীচে বলিয়া আমার পাশের টেবিলটা বাছিয়া লইল।

ভাল চা তৈরির জন্য দক্ষিণাফলে এই 'টি-টাইম' রেস্তোরাঁর নাম আছে। মস্ত একটা হলঘরে ছোট-ছোট টেবিলের চারপাশে চারখানা করিয়া চেয়ার, কাঠের খুপটির মুখে পরদা বুলাইয়া মহিলাদের সুব্যবহার বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা ইহার করে নাই। সকালে সন্ধ্যার বিস্তর লোক 'টি-টাইম'-এ আসে চা খাইতে। চা-এর নেশাটা সময় অসময়ে প্রবল হইয়া দেখা দেয় বলিয়া আমাদেরও দিনের ভিতর দু-একবার আসিতে হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত মেয়ে বা মহিলার আবির্ভাব কখনও দেখি নাই। বাক্সালী মেয়ের রেস্তোরাঁতে যাওয়া অভাববি একটা আয়োজন ও বিলাসের ব্যাপার, শুধু তাই নয় সেটা স্থান-কাল নির্বাচন সাপেক্ষ। বেলা এগারটায় স্লিপার বসিতে বসিতে গা'ছাড়া ভাবে রেস্তোরাঁতে ঢুকিয়া একদল পুরুষের মাঝে বসিয়া এক কাপ চা খাইয়া নেওয়া বাক্সালী তরুণীর পক্ষে আজও এতটা অবাস্তবিক যে অসময়ে বেকারটি লোক উপস্থিত ছিল একবার চোখ তুলিয়া লক্ষ্য করিল। কেহ মুহূ হাসিল, কাহারও চোখ কোঁড়কে চকচক করিয়া

উঠিল। দু-দিনই দুটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মেরেটিকে দেখিয়া মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, সে-মনোবৃত্তিকে সংসারান্ত তুট করিবার উদ্দেশ্যে চা-এর পেয়ালা সামনে লইয়া কান খাড়া করিয়া রহিলাম। ঘূবকটি দোকানের ছোকরাকে ডাকিয়া দু-বাটি চা'র কথা বলিল।

ছোকরা চলিয়া গেলে মেরেটি বলিল, 'আমার চা-এর স্বরকার নেই, আপনি বরং দুটো বিসকিট নিন।'

বলিল খুবই আন্তে, হাতদুই মাত্র ব্যবধানে উৎকর্ণ হইয়া আছি বলিয়াই শুনিতে পাইলাম।

'দুটো বিসকিটে আর কি এগুবে, তা ছাড়া খালিখালি ব'সেই বা থাকবেন কি ক'রে।' ঘূবক উত্তর দিল।

কি ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কথা শুনিয়া মনে হয় এর চা হয় তো ওর বিসকিট হয় না—কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল।

মেরেটি বলিল, 'আমি তো বা হোক কিছু খেয়ে বেরিয়েছি, আপনার কি হবে, চট ক'রে মেল থেকে একবার ঘুরে আসুন না।'

'মেনে মিল বন্ধ, উপোস ক'রা অভ্যাস আছে, আমার জন্তে ভাববেন না।'

পাশে বসিয়া শুনিতেছিলাম। সভ্য জগতে উপকার করিবার এবং তা গ্রহণ করিবারও একটা রীতি আছে; শুধু ইচ্ছাটাই সব নয়।

মেরেটি বলিল, 'আপনারা যেন কেমন—ঠেকা-বেঠেকায় দুটো চাকাও কি যোগাড় করতে পারেন না।'

পিছন ফিরিয়া আছি, ঘূবকটির মুখের ভাব দেখা গেল না। উত্তর হইল, 'র‍্যাডিন ব'রে তো শুধু যোগাড় ক'রেই আসছি, আপনি না

পঞ্চ না ভ

চিনলেও জানাশোনা সবাই বোগাড়ে লোক ব'লে চিনে নিচ্ছে—
সেটাই হচ্ছে বিপদ।'

'কি সজ্জাই না করলেন। আমার হাত ধালি ক'রে হলো তার
শুক, কান ধালি ক'রে হ'লো শেব—উঃ কি বহুনিটাই খেয়েছিলান
বাড়িতে। টিকিয়ে রাখবার আন্দাজ চাট্‌চাট পর্বন্ত উঠলো না, তার
মধ্যে আবার কতই না দলাদলি। বাক, আজকের উপায়টা হবে কি,
এ সাত-আট মাইল পথ হাঁটতে হবে? বাব্বা: ভাবতেও গা-হাত-পা
অবশ করে।'

'তা ছাড়া উপায় কি। দেড়টার আগেই পৌছান দরকার, দু
হাজার লোক কারখানার বাইরে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। এ
কারখানাটা বোগ দিলে ফ্রাইকারের সংখ্যা আরও পাঁচ ছ'শো
বেড়ে যাবে।'

এতক্ষণে এদের সম্পর্কে যোঁটামুটি ধারণা করিবার মত কিছু তথ্য
সংগ্রহ করা গেল। অধুনা যে শ্রমিক আন্দোলন চলিয়াছে তার সঙ্গে
বিশেষ সংশ্লিষ্ট সে-বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। মতবাদের দিক
দিয়া বিচার করিলে আমি এদের বন্ধুর পর্যায়ে পড়ি না, ওদের
অভিযান আমাদেরই বিরুদ্ধে। কৌতূহলের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন
ঘটিল।

যুবকটি বলিতেছিল, 'আপনার কালকের বক্তৃতা এমনিতে খুবই
ভাল হয়েছিল, কিন্তু অতটা একসাইটিং কথা বলবেন না, তাতে সব
ক্ষেপে যেতে পারে।'

'তাই কি! আমার তো তেমন মনে হয় নি। হলোই বা জতি
কি—যে শাস্ত এরা, একটু ছেপিয়ে দেওয়া মন্দ নয়।'

পঞ্চম অধ্যায়

আবিতেহিলাম, কার মেয়ে কতদূর পড়িয়াছে, এই অবার চলা-কোরার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিবার কেহ আছে কিনা, আজিকার লম্বা পথটা স্নিপারে ভর করিয়াই পার হইবে, না অল্প কিছুটা উপায় করিবে। ইচ্ছা হইল বলি, মজুরদের কাছ হইতে কিছু-কিছু মজুরি নিলেইতো আর এতটা কষ্টে পড়িতে হয় না। একটু আলাপ করিবার আগ্রহ না হইল এমনও নয়। অসহযোগীদের সহযোগী হইয়া বহুদিন পূর্বে কিঞ্চিৎ স্বদেশী করা গিয়াছিল তারপরই ওজনে এত ভারি হইয়া পড়িলাম যে কোনো আন্দোলনের ঢেউ আর স্মৈর্ধে ব্যাধাত ঘটাইতে পারিল না। বিশেষতঃ শ্রমিক আন্দোলনটা স্বার্থবিরুদ্ধ বলিয়া পুরাপুরি বিরুদ্ধ মত পোষণ না করা সত্ত্বেও, নিতান্ত শখের ব্যাপার হিসাবেও বাবার অল্প তার সঙ্গে কোনো রকম যোগ রাখা সম্ভব হয় নাই। বিলেতে বসিয়া এবার দু-চার রকমের নিষিদ্ধ কর্মের সঙ্গে এ কাজটাও সংকীর্ণিত করিয়া আসিয়াছি। নেহাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত না করিলে এ জাতীয় হেঁচকি-টাকি আজকাল মন লাগে না। যদিও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো ধরই বড় একটা রাধি না, তবু বাবার গত সাতের কথাবার্তায় এটুকু আভাস পাইয়াছি যে এবার তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যাতে আমাদের কারখানা নিয়া চূর্তালনার পড়িবার মতো কোনো কারণ না ঘটে।

চিন্তায় বাধা পড়িল। চা শেষ করিয়া উভয়ে উঠিয়া পড়িয়াছে। অনেকটা খেলা বসন্তঃই আমিও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াইলাম, মুহূর্ত মাত্র দ্বিধার পর আগাইয়া গিয়া বুকেটিকে বলিলাম, ‘দেখুন—’

দু-জনেই ঘুরিয়া পাড়াইল। বলিলাম, ‘কিছু মনে করবেন না, আপনার ভোটাধিকারীদের মিটিং-এ বাচ্চেন, আমাকে সঙ্গে নিতে

আপত্তি আছে? শুধু এ বিষয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করা, তা ছাড়া অল্প কোনো উদ্বেগ নেই।’

ওদের মধ্যে একবার চোখাচোখি হইল। যুবকটি বলিল, ‘আমরা বাচ্ছি হেঁটে।’ আমার পরিচ্ছদ ও চেহারার দিকে ভাল করিয়া একবার নজর করিয়া দেখিল। ‘প্রায় আট মাইল রাস্তা, পারেন তো চলুন, আপত্তি কি?’

জানাইলাম আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে, হাটিতে হইবে না কাকরই। মেয়েটি কথার বোগ দিল। ‘তা হলে বলুন আমাদের আপনার সঙ্গে যেতে বলছেন। তা বেশ, এতটা পথ যে হাটিতে হবে না সেই রকম। শৌখিন লোকদের এসব শব্দ হ’লে তো আমরা বেঁচে যাই। এক সঙ্গে বাচ্ছি, কথা বলতে হলেই নামের দরকার, আমার নাম মীনাক্ষী, ঠুর নাম তেজেন, আপনার—’

‘রম্ভত।’ ভাবিলাম অমিক নেতা হইবার উপযুক্ত বটে।

গাড়ির কাছে আসিয়া মীনাক্ষী বলিল, ‘বাঃ, এইটাই আপনার গাড়ি। ঢুকবার সময় চকচকে বিরাট গাড়িখানার দিকে চেয়ে ভাবছিলাম মালিকটি কে—ভাগ্যি দেখুন বেকুবার সময় মালিক আর গাড়ি দু’এর সঙ্গেই পরিচয় হ’য়ে গেল। আমি সামনের সিটে বসবো।’ বলিয়া আমার পাশের সিটে আসিয়া বসিল।

তেজেন বসিল পিছনে। কিছুদূর যাওয়ার পর মীনাক্ষী বলিল, ‘কান পেতে আমাদের সব কথাইতো শুনেছেন, ঐ লোকটির যে ষাওয়া হয়নি তাও জানেন নিশ্চয়—অতৃতকে ষাওয়ার শব্দওতো ষাকা উচিত।’

‘নিশ্চয়।’

পন্ন না শু

‘আর একেবারে চৌরজিতে গিয়ে বাঁধবেন, এমিকে রেস্তোরাঁগুলো অতি বাজে ।’

আমার চোখের দিকে একবার তাকাইল টোটের কোনে মুহু হাসি—অহুরোধের সঙ্গে অভিব্যক্তিটি ভাল লাগিল না। হালকা, গভীর বা-ই হ’ক, সময় কাটাইবার গতানুগতিকতার হাত এড়াইবার জন্ত বাহির হইয়াছি, নিরাশ না হইলেই হইল। দুজনকে নিয়া বেশ বড় একটা রেস্তোরাঁতে চুকিলাম। তিন জনেই বসিয়াছি, মীনাক্ষী তেজেনের কানের কাছে মুখ নিয়া কিসকিস করিয়া কি বেন বলিল। আমি আপত্তি জানাইলাম, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে গুরুত্ব কানে কানে কথা বলা অভ্যাস ।’

‘তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত বলেইতো কানে-কানে বলতে হলো ।’

বেশ সহজভাবে মীনাক্ষী জবাব দিল। বুঝা গেল অভ্যাস এটিকেটের দ্বার সে ধারে না। ‘বয়’ আসিলে আমি কিছু বলিবার পূর্বেই মীনাক্ষী বেহু সামনে রাখিয়া নিজের গহনমত দু-জনের আন্দাজ খাবার অর্ডার দিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘ছুটো ক’রে অর্ডার দিচ্ছেন কেন ?’

‘আমি বাদ, খেয়ে বেরিয়েছি ।’

‘সে-তো বা হোক কিছু ।’

‘একটি কথাও কান এড়ায় নি দেখছি—সেই ‘বা হোক কিছুতেই’ চ’লে যাবে ।’

‘তা হয় না ।’

বলিয়া পুনরায় ‘বয়’কে ডাকিবার উদ্যোগ করিতে তেজেন গভীর মুখে বলিল, ‘ওকে পেড়াপিড়ি ক’রে কোনো ফল হবে না, অনর্থক ।’

পঞ্চদশ

ওরই বাড়িতে বেন আমরা থাইতে বসিয়াছি, অনেকটা সেই রকম ভাব লইয়া মীনাঙ্কী আমাদের খাওয়ার তদবির করিল। আহারাভ্যে তিনজন মিলিয়া রওনা হইয়া পড়িলাম। পথে মীনাঙ্কী বলিল, 'মোটামুটি আদায় করা যায় এমন একটি লোক জুটলো এত দিনে।'

'মাপ করবেন, ও শখটি নেই।'

'আচ্ছা রজতবাবু, এ আপনার নেহাৎই কি শখ,—এ কাষের ওপর সত্যিকারের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস একটুও নেই।'

'পরিচয় যখন হয়েছে ও আলোচনা অল্প সময় করা যাবে—
ডাইনে ?'

'হ্যাঁ।'

মীনাঙ্কীই রাস্তা বলিয়া দিতেছিল। বিদেশ হইতে কিরিয়া এমিকে আনা হইয়া ওঠে নাই, পূর্বে এ রাস্তা ধরিয়া দু-একবার আমাদের ক্যান্ট্রিতে গিয়াছি মনে পড়ে। এক মাইলের ভিতর একটা জুটমিল, তিনটা ক্যান্ট্রি। মিল-এ ধর্মঘট হইয়াছে তিনিয়াছি, এখন কোনটার উপর হানা দেওয়া হইবে জানিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম না, একটু পরেই তো জানা যাইবে।

বহু দূর থাকিতেই হাজার হাজার লোকের মিলিত কোলাহল ফিকা হইয়া কানে আসিয়া পৌছিল। মীনাঙ্কী নড়িয়াচড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বলুন তো রজতবাবু, কি হবে দু-চার টাকা বেতন বৃদ্ধি, দু-এক ঘণ্টা শ্রম বাঁচানোর আবেদন নিরে এত মাতামাতি ক'রে—এতে ক'রে কাকর চাহিদা মেটে!'

পলার স্বর ঠিক স্বাভাবিক মনে হইল না। পাড়ি চালানর ফাঁকে

ভাল করিয়া একবার তার মুখের দিকে তাকাইলাম। বরাবর সামনের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, জোর হাওয়ার মুখের উপর চকলভাবে উড়িতেছে সমুদ্রের অসংলগ্ন চুলের গুচ্ছ, চোখে মুখে নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার দীপ্তি—যা কিছুক্ষণ পূর্বেও ছিল না। মেয়েটি অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ এবং অতি সহজেই উত্তেজিত হয় বলিয়া মনে হইল। বলিলাম, 'এননি ক'রে ধীরে ধীরেই দাবির মাত্রা বাড়িয়ে চলতে হবে।'

'ওতে আমার বিশ্বাস নেই ওরা—অর্থাৎ আমরা, পাইনি কিছুই, পাবও না—এ বঞ্চনার বাতে একদিন শেষ আসে, আমাদের শেষ হতে হবে শুধু তারই চেষ্টায়। ঐ মজুরদের মাঝে গিয়ে যখন দাঁড়াই, ইনিরেবিনিয়ে বক্তৃতা দিয়ে শক্তিশালী হাড়ুডিগুলোকে যুক্তিশালী কলম বানিয়ে তুলবার প্রবৃত্তি আমার থাকে না—'

অজস্র কঠোর মিলিত ধ্বনি, মীনাক্ষী ধামিল। অতি নিকটে আগিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু একি, আমাদের দ্বন্দ্ব ক্যাক্টরির সামনেই যে সকলে ভিড় করিয়া আছে! যতটা জানি তাতে বিচলিত হইবার মতো কারণ নাই বলিয়াই আমার ধারণা, তবু এই কর্মীদের সঙ্গে বহন করিয়া এখানে উপস্থিত হওয়াটাই কতৃপক্ষ মস্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবে। অবশ্য একদিক দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া বাইতে পারে, উপস্থিত কর্মীদের নিকট আমি পরিচিত না হইবার কথা। কারণ ব্যবসার সঙ্গে আমি মোটেই সংশ্লিষ্ট নই, তা ছাড়া বহুদিন বিদেশে কাটাইয়া গেবে মাত্র বেশে ফিরিয়াছি। তবু কিছুটা দূরে গাডি দাঁড করাইলাম। খোলা ময়দানে এখানে ওখানে ভিড় করিয়া আছে শত শত লোক, থাকিয়া থাকিয়া তাদের মিলিত কঠে ভর করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে বিবিধ ব্রকম দাবির হুড়ার।

পঞ্চম অধ্যায়

গাড়ি থামিতেই বহুলোক আগিয়া খিরিয়া দাঁড়াইল। তিনচার জন বারা আগাইয়া আসিল বোধ হয় মাতব্বর। তেজেন ও মীনাকী তাদের নিয়া একটু ভকাতে গিয়া কি যেন কথাবার্তা বলিল, তারপর সকলকে সঙ্গে করিয়া তেজেন গেল ভিড়ের দিকে আগাইয়া, মীনাকী খিরিয়া আসিল আমার কাছে। হাজার হাজার শ্রমিকের চকল গতিবিধির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মীনাকী বলিল, 'রক্তবাবু আমার জিতেছি। এ কারখানার সবাই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।'

ধবর শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। এই জয় পরোক্ষে আমাকেও আঘাত করিল সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কারবার হইতে অল্প টাকা আয় হইতেছে তার শ্রমিকদের মুখ সুবিধার অল্প দু-হাজার টাকা ব্যয় বাড়াইয়া দিতে হুঁত্বিত হইবার কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না—আছে নিশ্চয়ই, গবিতে বসিলে হয়তো তার মর্ম উপলব্ধি করা যাইবে। নানা কথা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মীনাকীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলাম, যেখানেইছিলাম তার মুখ-চোখে সার্থকতার উজ্জলতা। চলতি গাড়ির হাওয়ার অত্যাচারে অনেক চুল তার আলগা হইয়া উকুখু হইয়া গেছে, তারই কয়েকটা আগিয়া পড়িয়াছে মুখে-চোখে ও গালের উপর মোটরের একপাশে হেলান দিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল, সে-দিকে চোখ রাখিয়া বলিলাম, 'আপনাকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে।'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া স্কোচ বোধ করিলাম, হয়তো সজ্ঞ হইল না।

মীনাকী কিন্তু আমার চোখের দিকে চোখ রাখিয়া মুখ হাসিয়া জবাব দিল, 'তাই নাকি।'

দু-তিন হাজার লোক জমায়েত হইয়াছে সামনের বয়দানে,

পদ্ম নাট

সেখানেই সভা বসিবে। তেজেন আসিয়া বীণাক্ষীকে কহিল, 'চলুন, আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্য ওরা অস্থির হয়ে আছে। দেখবেন, একটু রেখে-ঢেকে বলবেন, ক্ষেপিয়ে দেবেন না—বলতে দাঁড়ালে আপনার আবার খেয়াল থাকে না। স্টুটরাজ বা মালিকদের সঙ্গে একটা দাঙ্গা বেধে গেলে ভয়ানক ঝগড়াটে পড়তে হবে।'

বীণাক্ষী কোনো জবাব না দিয়া আগাইয়া গেল।

এই বাইশ কি তেইশ বছরের মেয়েটিকে বনবন জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া সভায়লে একটা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া জনতা স্তব্ধ হইল তার মুখের কথা শুনিবার জন্য। অপরিমেয় শ্রদ্ধার ছোয়াচে মাথু বেন আপনা হইতেই প্রছিন্ন হইয়া ওঠে, অপরিচ্ছন্ন কক্ষ জনতার একান্তে উত্তোলিত স্বকোমল নারী দেহের ঐ তেজোদীপ্ত ভঙ্গির দিকে তাকাইয়া আবার মনেও কোতুলনের পাশে বা জাগিয়া উঠিল তাকে সম্মম ছাড়া আর কি বলিতে পারি।

বাধাধরা সম্বোধনের সঙ্গে বক্তৃতা যেমন শুরু হয় তেমনই শুরু হইল। সম্মুখে তার বক্ষিত নর-নারীর এক বিরাট সমষ্টি। এ মেয়েটির মুখ হইতে তারা শুনিতে চায়, কি তাদের নাই, কি তাদের পাওয়া উচিত, কেমন করিয়া তা পাওয়া যাইবে। অশিক্ষা, অভাব, অপরিচ্ছন্নতার পুঞ্জীভূত আবর্জনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বীণাক্ষী তখন বলিতেছিল,—

'—কুণ্ডা শুধু যে তোমাদেরই তা নয়, এ কুণ্ডার জালা, এ দারিদ্র আজ ভদ্র-অভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের—সকলের গায়ে দারিদ্রের এই কুংসিত বা। ভদ্রশ্রেণী তার উপর পটি জড়িয়ে গোপন করে, তোমাদের পড়ে থাকে অনাবৃত, খোলা তাই কুংসিত, ভিক্ষুকের মতো ধরেছে পচন, তাই অবসন্ন—'

‘ওছব ছুনতে চাইনে, মাইনে বাড়বে কিনা তাই বলো—’

বে পাশটাতে মাঝে মাঝে গুগুগোল হইতেছিল কখাটা সেখান হইতেই উঠিল। ‘চপ্ হারামজাদ; দাও শালাকে বা’র ক’রে—’ ষানিক হম্মার পর গোলমাল ধামিল। তেজেন আসিয়া দাঁড়াইল আমার কাছে, সত্তার দিকে চোখ রাখিয়াই বলিতে লাগিল, ‘আমার এসে থেকে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল—এখন তো বিশ্বাসী লোকের কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেল, এ কারখানার লোকগুলো মালিকের কাছ থেকে টাকা ধেরে এসেছে গোলমাল বাধাতে। গতবারের স্টাইক নিয়ে এটার মালিকদের মীনাঙ্কীর ওপর রাগ করে গেছে, সব দাবি মেনে নিয়ে ক্যান্ট্রি চালু করতে হয়েছিল কিনা—কিন্তু মজুরগুলো কি বেইমান !’

গভরাজির আলোচনা ও বাবার নিশ্চিন্ততার সঙ্গে ধর্মঘটের শাকল্যের যোগাযোগ কোথায় এখন বুঝিতে পারিলাম।

মীনাঙ্কী অমন বেরাদব জ্রোতার স্বত্র ধরিয়াই হয়তো বলিতেছিল,—

‘—মাইনে বাড়ানো তো দূরের কথা, কোনো স্বথ সুবিধাই কবুল আনি করছি না। তোমরা পাবে না কিছুই, তোমরা—’

‘কিছু মিলবে না বছে বছে বুলি ছোনো—নাচনেওয়ালী নাচ দেখাও—’

‘মারো শালাকো, চপ্‌রাও বদমান—’ অশ্রাব্য গালাগাল ও গোলমাল, তারপর হাতাহাতি। দেখিতে দেখিতে দুটা পক্ষ হইয়া গেল। অবস্থা গুরুতর বুঝিয়া তেজেন গিয়া দাঁড়াইল মীনাঙ্কীর টেবিলে বসিয়া। মীনাঙ্কী তখন নির্বাক সোজা দাঁড়াইয়া আছে তার উঁচু

হানটিতে, পালাপাশি, ধৈ-ঠে, বারপিট, কোনো কিছুতেই সে যেন বিচলিত নয়। বহনকারীর রেশমি কাপড়ের মতো হালকা ইচ্ছাশক্তি থাকির মতো শক্ত ও সহনশীল করিয়া তবে সে কর্ষক্ষেত্রে নামিয়াছে।

বারপিট ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া তেজেন ও যাতকরদের দু-একজন মীনাক্ষীকে অহরোধ করিল সভা ছাড়িয়া সরিয়া আসিতে মীনাক্ষী বলিল, 'ওদের ভাল বরদোর তৈরি ক'রে দেওয়ানো থেকে মাইনে বাড়ানো—আরও অনেক কিছু—সবতো আবিই আদায় ক'রে দিয়েছি, ওরাই আজ—'

কথা শেষ হইল না, কে যেন একটা চিল ছুঁড়িয়া মারিল মীনাক্ষীর মাথা লক্ষ্য করিয়া।

মীনাক্ষী কাত হইয়া পড়িতেই তেজেন তাকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে জনতা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কে কাহার পক্ষে বুঝিবার জো নাই, চারিদিকে মারামারি আর হঙ্গা।

'শিগগির পাড়িতে যান।' বলিয়া তেজেন মীনাক্ষীকে বহন করিয়া পাড়ির দিকে ছুটিল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাবিতে পারি নাই। স্বয়ংচালিতের মতো চিন্তাহীনভাবে কাঁপাইয়া পাড়িতে ঢুকিয়া টিয়ারিং ধরিয়া বসিলাম।

ঝড়ের বেগে পাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম 'জান আছে ?'

'না, ভয়ানক রক্ত পড়ছে—আর একটু জোরে চালানো যায় না ?'

কলেজ হাসপাতালে মীনাক্ষীকে নামাইয়া লওয়া হইল। তখন তার জ্ঞান কিরিয়াছে। আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা ছিল না দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। সমস্ত মুখখানা টকটকে তাজা রক্তে লাল হইয়া

গেছে। রক্তে ভিজিয়া চোখের পাতা ভারি হইয়া ছিল, অতি কষ্টে টানিয়া ধীরে ধীরে চোখ খুলিল। নার্নে ভাস্কারে চারিদিক বিরিয়া ফেলিয়াছে, আমার দিকে চোখ পড়িতেই ঠোঁটের কোণে দেখা দিল মুহ হাসি। ক্লীণ দুর্বল কষ্টে বলিল, ‘এখন কেমন দেখাচ্ছে—’

এটা বোধ হয় আমার কিছুক্ষণ পূর্বের রূপচর্চার উত্তর। এমন অবস্থায় চুঃখের স্নান হাসি ছাড়া এ কথার জবাব আর কি থাকিতে পারে। এ হীন আক্রমণের সঙ্গে নিজের স্বার্থ ও সম্পর্কগত যোগস্বত্বের জন্য অপরাধের বোকা আমার মনের উপর চাপিয়া মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

তেজেন গেল মীনাকীর বাবা-মাকে খবর দিতে। সামান্য হুঁহতার খবর পাওরামাত্র কাহারো জন্য অপেক্ষা না করিয়া, এমন কি মীনাকীর সঙ্গে পর্যন্ত সাক্ষাৎ না করিয়া সরিয়া পড়িলাম। আমার পুরা পরিচয় অবগত হইলে মীনাকী ও তেজেন দু-জনেই ধরিয়া লইবে, এ তামাশা দেখাই ছিল আমার আজিকার আকস্মিক শখের একমাত্র কারণ।

বাড়ি ফিরিয়া পাড়ি হইতে নামিবার সময় গিছনের সিটে চোখ পড়াতে মুহূর্তের জন্য ধমকিয়া দাঁড়াইলাম—দাবী গদি ও কুশানের গার চাপ-চাপ মীনাকীর বেহের রক্ত—

বাড়ির সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল, মা আসিয়া প্রশ্ন করিলেন ‘সারাদিন ছিল কোথায়?’

বলিলাম, ‘অতগুলো টাকা দাম দিয়েছ, জিনিষটা বুঝে আনতে গিয়েছিলাম।’

আশ্চর্য হইয়া মা প্রশ্ন করিলেন ‘কী জিনিস—কোথায়?’

‘দেখগে বাও, পাড়ির গদির উপর রেখে এসেছি।’



বিরের কয়েক দিন পরের কথা।

স্বলতা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বালিশে এমন লালচে দাগ পড়ে কেন?'

অমল ড্রেসিংগাউনের কোমরবন্ধনীতে একটা প্যাচ ক'বে মন্থর চালে একটা সিগারেট ধরালো। ঠোঁটের কোণে হাসি। হাসির পেছনে ষিখাটুকু ছিলো স্বলতার চোখে তা ধরা পড়লো কি না বলা যায় না। দেশলাইর কাঠিটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিতিয়ে অমল ব'লে উঠলো, 'চূলে কলপ দিই যে।'

ব'লে উঠলই বলতে হবে, উত্তরটা যেন ঠিকরে বেরলো।

'কেন?' স্বলতার মুখেচোখে আশ্চর্যের ভাব। অমল একটা কোচের উপর বসলো। 'একুশ বাইশ বছর থেকেই কানের দু'পাশ দিয়ে চুল পাকতে শুরু করলো, অনেক কিছু ক'রে দেখলুম, কিছুতেই যখন কিছু হলো না তখন আর কি করি বলো।'

স্বলতা হেসে উঠলো। 'খ্যাৎ, এ ভারি বিজিরি—কলপ তো মাঝে বাজে ফচকে লোকরা। না, এ তুমি ছেড়ে দাও; কানের দু'পাশে ক'গাছি পাকা চুল থাকলে তোমাকে কেউ বুড়ো ভাববে না—আর অন্তে ভাবলেই বা কি, আমি না ভাবলেই হলো।' স্বলতা মুখ টিপে হাসে।

'এ অত্যন্ত অভাব দারণ।' অমল বেশ একটু ঘোরের সঙ্গে বলে। 'এক সময়ে তবলা বাজালে লোকে বকাটে ভাবতো—জিনিসটার

‘এ্যাসোসিয়েশন’ ভালো নয়, ভালো ক’রে নিগেই হলো। দাড়ি কামানো, চুল ছাটা, মুখে পাউডার বসা, এমন কি আধুনিকায়ের মুখে রং মাখা, বদ্বি চলতে পারে, কলপের অপরাধটা কি? বরং এটা শুধু বিলাসিতা নয়, বিশেষ একটা প্রয়োজনে আসে—হানবিশেষ বয়সের লম্বে চেহারার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।’ গড়গড় ক’রে অমল তার হুস্তিগুলো ব’লে গেলো।

অমলের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে স্থলতা বললো, ‘তোমার অভদ্র কথার জবাব দিতে আমি পারবো না, অন্তায় নয় তা মানলাম, কিন্তু স্তন্যে কেমন যেন বিচ্ছিন্নি শোনায়—ভাবতেও ভালো লাগে না। ও ছাই তোমাকে মাখতে দেবো না, চুল পেকেছে তো বয়ে গেছে।’

‘সে দেখা যাবে।’

দৈনিক কাগজটা হাতে নিয়ে বসবার ঘরের লম্বা কৌচটার পা ছড়িয়ে অমল শুয়ে পড়লো। যদিও গোপন করার ইচ্ছা ছিলো না, তবুও স্থলতাকে কথাটা ব’লে কেলে মনটা কেমন যেন তার ধরাপ হয়ে গেলো। মনে পড়লো তেরোচৌদ্দ বছর আগেকার কথা। প্রথম বখন চুল পাকতে শুরু করলো কথায় কথায় সে কেমন সহজে পক কেশের উল্লেখ ক’রে বাধক্যের দাবি জানাতো। বখন থেকে কলপ বরলো, জানা-চেনা এমন কেউ ছিল না যাকে যেতে সে কলপের গুণ-কীর্তন শুনিতে যেত নি। বয়েলটা জিশের কোঠায় পা দেবার পর থেকে কথাটা গুরুতর হ’য়ে গুটিয়ে যেতে শুরু করলো, হালকা ভাবে ব’লে বেড়ানো দূরের কথা কেউ তার উল্লেখ করলে অব্যক্তি বোধ করে। বিয়ে করার অন্তে ব্যস্ত সে মোটেই ছিলো না তবু পরজিশের

পদ্ম নাভ

পর থেকে বরসের গুনতিটাও এড়িয়ে চলতে লাগলো। যখন তখন ঠিকুজি নিয়ে আলোচনা করা ছিল একটা বাতিকেয় মধ্যে; সেটা আশ্রয় নিলো স্ট্রটকেসে, নেহাৎ পেশাদার গণক ভিন্ন কারুর কাছে আত্মপ্রকাশ করে না। গোপন করার বিশেষ একটা চেষ্টা নিয়ে এলব করেছে এমনও নয়, কখন যেন আপনা থেকেই স্বভাবের গুটিকর সহজ প্রকাশ সজ্জিত হয়ে গেছে।

স্বলতা কলপ মাথতে বারণ করছে, কিন্তু কথাটা যেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একুশবাইশ বছরের সেই সামান্য গুপ্ততা পনের বছরে আরও ব্যাপ্ত হয়েছে নিশ্চয়ই, তা ছাড়া কলপ মেখে-মেখে চুলের রং হয়ে গেছে কটা—বেটা হবে আরও দৃষ্টিকটু।

‘তোমার আগিলের সময় হয়ে গেলো, উঠবে না?’ স্বলতা ঘরে ঢুকে বললো।

‘হ্যাঁ, এই যাচ্ছি।’

স্বলতা চলে গেলো কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত অমলের মধ্যে নড়বার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। আগিল তার নিজের, কিন্তু কর্তা হয়েও নিয়ম ভঙ্গ সে কখনো করে নি। দিন দুই হলো সময় মতো আগিলে যাওয়া হচ্ছে না, গিয়েও কাজ কিছুই করে নি, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কর্মচারীরা সাহেবের অবস্থাটা বেশ কৌতূকের সঙ্গে উপভোগ করে নিশ্চয়ই। অমল সেটা বোঝে, কিন্তু কেমন একটা বিরাট ক্লান্তি এসে জুড়ে বসেছে তার সমস্ত দেহে। তার উপর মনে একটা একটানা অস্বস্তি আর ভয়। স্বলতার অমন স্নানর মুখচোখ, অমন রিঙ দৃষ্টির দিকে তাকাতে কেমন যেন তার ভয় হয়। অমলের মনে হয়

স্বপ্নতার চোখ দুটো রাজে বদলে যায়—হাড়-অমানো ঠাণ্ডা দুটি নিয়ে সেজুটো চকচক করতে থাকে।

রাজে স্বপ্নতা বালিশের উপর কলুইয়ে ভর ক'রে কথা বলছিলো, অমল বললো, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও।'

'ই্যা, তা হলেই মজায়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারো, না—আজ্ঞা, এমন বাতি নিভানোর জন্তে অস্থির হয়ে ওঠ কেন বলতো?'

অমল শেষের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে প্রতিবাদ করলো প্রথম কথার। শোয়া থেকে রীতিমতো ষাড়া হ'য়ে ব'লে বললো, 'না কেনে শুনে এমন বাজে কথা সব বলো, কাল তুমি ঘুমোবার অনেক পরে আমি ঘুমিয়েছি—চোখ বুজে কথা শুনছিলুম, তেবে নিলে ঘুমিয়ে পড়েছি।'

বলার ভঙ্গিতে বেশ একটু রুক্ষতা ছিলো। এতটা জোরের সঙ্গে অস্বীকার করার মতো কি আছে কথাটার স্বপ্নতা বুঝতে পারে না, ঘুমিয়ে নিয়ে বলে, 'তা-ই হবে, আমি বুঝতে পারি নি।'

উত্তেজনার অসঙ্গতি নিজের কাছেও বুঝি ধরা পড়ে, গলার স্বর নরম ক'রে হালকাতাবে অমল বললো, 'আজকে দেখবো তুমি কত রাত আগতে পারো।'

'ধাক খেদ ক'রে রাত আগার দরকার নেই। কাল আগিল আছে না?'

'ধাক না আগিল, আমি তো কাকুর চাকর নই।'

কর্কশতাটুকু ঢেকে দিতে আররের রাজাটা অমল বাড়িয়ে দেয়।

কথার কথার স্বপ্নতা বললো, 'তোমার কলপের শিশি আমি কেনে দিয়েছি—ও মাথা চলবে না।'

‘আজ্ঞা সে দেখা শাবে, এখন রাখে ও-কথা, সেই যে সকাল থেকে বাথার চুকেছে—’

কিছুক্ষণ পর স্থলতা জিজ্ঞেস করলো, ‘কি গো, চুপ ক’রে আছ যে, ঘুমোলে?’

অমল নড়েচড়ে উঠে বললো, ‘না, শুনছি—বলো।’

‘কি শুনছো, আমি তো কিছু বলছি নে।’ স্থলতা হাসলো।

একটু পরেই অমলের নিজা ঘোষিত হলো। স্থলতাও হেসে চোখ বুজলো, ভাবলো লোকটির ঘুম একটু বেশি, সেটা বললে আবার চটে যায়।

জগে থাকার একটা সঙ্কল্প মনে ছিলো ব’লেই হয়তো হঠাৎ অমলের ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে ব’লে ষড়ির দিকে তাকালো—রাত হুটো বাজে, স্থলতা ঘেমন ছিলো তেমনি ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে অমল খাট থেকে নেবে এলো। বীরে বীরে অসংযত শাড়ির আঁচলটাকে সে টেনে দিলো স্থলতার দেহের উপর। স্থলতার দৈহিক কমনীয়তার অবাধ মুক্তি সে বেশ সহ করতে পারে না, এক দিকে ঘেমনই মুগ্ধ হয়, অল্পদিকে তেমনি লভানো দেহের দিকে তাকিয়ে হিম্মতল সাপের একটা চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে একটা ভয় বেশানো অস্বস্তি, বা সে অনেক চেষ্টা ক’রেও ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

পাতলা শাড়ির উপর দিয়ে ভেসে উঠেছে স্থলতার শুভ্র দেহের আভা; অমল চোখ কিরিয়ে নিলো—নিজেকে তার বড়ই অসহায় মনে হয়। মনে পড়ে অনেক বছর আগেকার আর একটি রাজির কথা। অরুণার দিদির বিয়েতে এক রাজি ছিলো সে অরুণাদের বাড়ি।

পঞ্চদশ

পাশের ঘরে অরুণা শুয়েছে, শুধু এ ধারণাটুকুর অন্তে শত চেষ্টা সবেও সারা রাত সে ঘুমোতে পারে নি, কান পেতে সজাগ হয়েছিলো। আর আজ চেষ্টা ক'রেও জেগে থাকতে পারে না কেন।

অমলের সঙ্গে অরুণার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়ে ছিলো অনেক দূর। একে একে সে-সব দিনের এক-একটি ঘটনা অমলের মনের উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে থাকে। অবশেষে একদিন মহা বিড়ম্বনা ও অসম্মানের মধ্য দিয়ে সে-পরিচয় শেষ করতে হলো, বার একমাত্র কারণ ছিলো তার আর্থিক অবস্থা। সেই থেকে নিজে থেকে যেয়েদের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে নিলো অনেক দূরে, কারণ নারীকে বজিনী হিসাবে পাবার সম্পদ তার নেই এ সত্য সে আঘাতের মতো দিয়ে অমৃত্যব ক'রে এসেছে। এ লাঞ্ছনার প্রতিক্রিয়া হলো অর্ধ রোজগারে আশ্রয় চেষ্টা। সে-চেষ্টা তার সফল ও সার্থক হয়েছে, আজ সে নামকরা ঠিকাদারদের অন্ততম।

তার ব্যস্ত জীবনে নারীর প্রবেশ পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, এই ছিলো অমলের ধারণা। কিছুদিন আগে একদিন আবিষ্কার করলো ওদের পথ-চলা অস্তিত্বকেও অস্বীকার সে করতে পারে না—তার অনিচ্ছা সবেও দৃষ্টিকে ঘেন টেনে ধরে। সঙ্গে লোক থাকলে গম্ভীর মুখে হরভো বলে, ‘অনাদিবাবুর মেয়েরা না—’ বা ‘বাঙালীর মধ্যেও এমন টল, স্নিম কিগার আছে তা হ'লে’, অথবা ‘দিন-কে-দিন মেয়েদের স্বাস্থ্য কি হচ্ছে!’—গম্ভীর হ'রে একটা কিছু তাকে বলতে হয়। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন অমল স্থির ক'রে ফেললো সে বিয়ে করবে, নারীর মূল্যের তহবিল ভর্তি, তার ভাবনা কিসের।

সত্যি তো, কি তার না আছে! স্থলতাকে সে বাড়ি, পাড়ি, এই

আশাব্যবপত্র—জীবনের শক্তি নিংড়ে বা কিছু অর্জন করেছে সবার মাঝে এনে বসিয়েছে, তবু এই অসহায় দৈন্ত-বোধ কেন! অরুণার সেই অমল বেন মিশে আছে তার সম্পদের অশুপরিমাণে, প্রতি মুহূর্তে সে তাকে উপহাস করে; তার সঙ্গে দিনরাত যুঝতে গিয়েই সে এমন ক্লান্ত। এ বিশ্বের হাত থেকে কি ক'রে সে রেহাই পাবে।

অমল সিগারেট ধরিয়ে আন্তে-আন্তে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলো। জ্বলতার মুখের দিকে চোখে পড়তেই মনে হলো বড়ো বেশি সুন্দর ঐ মুখ—অকারণ ভিক্ততার মন তার ভরে উঠলো।

জ্বলতার বাপের বাড়িও কলকাতায়, তবে কিনা শহরের এম্বাধা-ওম্বাধা। সকালের দিকে কি সব জিনিসপত্র নিয়ে ও-বাড়ি থেকে লোক এসেছিলো, সে ব'লে গেছে জ্বলতার মা'র শরীরটা নাকি তেমন ভালো নেই। কথাটা শোনা মাত্রই অমল রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠলো। জ্বলতাকে বললো, 'তোমার তো তা হলে একবার যাওয়া দরকার।'

'না, তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু জ্বর মতন হয়েছে। মা তো যাবার কথা কিছুই ব'লে দেন নি।'

'বলবেন আবার কি, তাঁর খবর দেওয়ার কথা তিনি দিয়েছেন, বাকিটা তো আমাদের কর্তব্য।'

জ্বলতা একটু লজ্জিত হলো। বললো, 'বেশ তো, তুমিও চলো না একবার দেখে আসবে।'

অল্পখটা খুবই সামান্য তবু অমল জ্বলতাকে ভালো ক'রে দেখাশোনা করার উপদেশ দিয়ে ব'লে এলো, দিন সাতেক পরে সে নিজেই আসবে তাঁকে নিয়ে যেতে। এমন কি সমস্ত পেনে মাঝে একদিন

এসে ঘুরে বাবে, সে কথাও বললো। জামাইএর ব্যবহারে খাণ্ডড়িরও সম্বন্ধটির অন্ত রইলো না।

মস্ত ছুটির আনন্দ নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো। কয়েকটা দিনের মধ্যে আত্মদম ও আত্মপীড়নের হাত থেকে সে মুক্ত। যে দাড়ি কাটানোটা তার নিত্য কর্তব্য মতো, কয়েক দিন ব্যবস সেটাও মনে হচ্ছিলো এক নীরস বাধ্যবাধকতা এবং তার অন্তরে দায়ী যেন স্থলতা। আপিস কামাই ক'রে দুটো দিন পা ছেড়ে কাটিয়ে দিলো বাড়ির ভিতর। অভ্যাস অনুযায়ী রবিবার সকালে ড্রয়ারটা টানলো কলপের সঙ্গে দেখলো মিনিটা নেট—স্থলতা বলেছিলো বটে সেটা সে কোলে দিয়েছে। আরনার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে চেয়ে নিজেই সে চমকে গেলো। একমাথা উকখুক বিবর্ণ চুল, সমস্ত মুখটা ছেয়ে গেছে কাঁচাপাকা দাড়িতে। তা থাক—এ নিয়ে আর কয়েকটা দিন ভাড়াহা না করলেও চলবে।

সেদিন দুপুরের দিকে পা-হাত-পা ব্যাথা ক'রে তার জর এলো। ইনফ্লুয়েন্স, দুটো দিন ভোগাবে, কাউকে খবর না দিয়ে চুপ ক'রে সে প'ড়ে রইলো।

সামান্য জর দিন দুই পরেই ছেড়ে গেলো। অমল তাত পথ্য ক'রে দিবা নিদ্রা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে গুয়ে গুয়ে একখানা গল্পের বই পড়ছিলো, আচনকা এসে ঘরে ঢুকলো স্থলতা। অমলের মুখের দিকে তাকিয়েই সে ধমকে গেলো। এগিরে এসে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'বাঃ চেহারার যে ছিঁরি করেছে—জর হয়েছে খবর দাওনি কেন বলতো?' খুব খানিকটা বুদ্ধাধিকার করবে ঠিক ক'রে স্থলতা ছুটে এসেছে, কিন্তু আর কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বেরলো না।

পদ্ম নাভ

অমল বিব্রত হ'য়ে অস্বস্তিচক একটা ভঙ্গি ক'রে বললো, 'তুমি খবর পেলে কার কাছে ?'

'বিনোদ কি কাছে ওদিকে গিয়েছিলো সে বললো, ওরই সঙ্গে তো চ'লে এসেছি।'

'এ ব্যাটার সব কিছুতে আগবাড়তি মাতব্বর—আমাকে না ক'রে—'

স্বলতা বাবা দিয়ে বললো, 'ও অস্ত্রাট কি করেছে—সে বাক, এখন বীরেহতে উঠে মুখটাকে কামিয়ে নাও ভো—মা, বাবা, মনি, বাণী ওরা সবাই আসছে তোমার অস্থখের খবর শুনে।'

'আসছে তো বয়ে গেছে, সে সঙ্গে আমার সাক্ষতে হবে নাকি।' নেহাৎই ধাপছাড়া ভাবে অমল ব'লে বললো, 'ই্যা—শোনো, বাট হাজার টাকার সেই কনট্রাক্টটা কাল সই হয়ে গেছে, প্রচুর লাভ থাকবে এটার।'

'সে পরে শুনবো, এখন ওঠো তো লক্ষ্মীটি—চেহারায় অমন একটা অস্থখের ছাপ ভালো লাগে না।' কথাটা স্বলতা এবার একটু ঘুরিয়ে বললো।

'মনি, বাণী ঠাট্টা করবে ব'লে ভয় হচ্ছে নাকি'—এ ধরনের কোনো একটা হালকা কথাও অমলের মুখ দিয়ে বেরলো না।

দাড়ি কামাতে কামাতে সে বললো 'চুলগুলো তো এই অবস্থায়ই থাকবে, শিশিটিতো ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

অমল হয়তো আশঙ্কা করছিলো কোনো একটা ক্ষেত্রে বা প্রতিবাদ, কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেলো স্বলতা তবুই একটা ছোট ভেঁকে পাঠিয়ে দিলো বাজারে।



